কিশোর কাহিনি সিরিজ

দাবানলের দেশে

সুচিত্রা ভট্টাচার্য

আনন্দ

দাবানলের দেশে

সুচিত্রা ভট্টাচার্য

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : ওঙ্কারনাথ ভট্টাচার্য

আনন্দ

আদরের ছুটকু,
অর্চিষ্মান কেশান-কে

আচমকা এমন একটা বিদেশ সফরের সুযোগ মিলে যাবে স্বপ্নেও ভাবেনি ঋতম। তাও আবার যেমন-তেমন জায়গায় নয়, অন্য এক মহাদেশে। প্রোফেসর জটাধর জোয়ারদারের মতো বিজ্ঞানীর খাস সহকারী হয়ে। কী সৌভাগ্য!

সক্কাল সক্কাল জরুরি এত্তেলা পেয়েই স্যারের বাড়ি ছুটেছিল ঋতম। আহ্বানের কারণটা তখন জানাননি প্রোফেসর জোয়ারদার। ফোনে জিজ্ঞেস করতে ঋতমেরও সাহস হয়নি। সবে মাস ছয়েক হল স্যারের কাছে গবেষণা শুরু করেছে সে। আগ্নেয়গিরি নিয়ে। এখনও সে স্যারকে রীতিমতো ভয় পায়। যাওয়ার সময় ধরেই নিয়েছিল গবেষণার বিষয়ে নিশ্চয়ই কোনও নতুন পয়েন্ট এসেছে স্যারের মাথায়। এক্ষুনি এক্ষুনি শুনতে না গেলে ভয়ানক চটে যাবেন জটাধরস্যার। যা কাজখ্যাপা মানুষ!

যোধপুর পার্কের বাড়িটায় পৌঁছে ঋতম অবাক। লিকলিকে চেহারার ছ'ফুট মানুষটি বেজায় চিন্তিত মুখে পায়চারি করছেন ড্রয়িংরুমে। ঋতম যে ঘরে ঢুকেছে, সে হুঁশও নেই। হঠাৎই নজর পড়তে থমকে দাঁড়ালেন জটাধরস্যার। ভুরু কুঁচকে সরাসরি প্রশ্ন, "তোমার পাসপোর্ট আছে?"

ঋতমের থতমত জবাব, "কেন স্যার?"

'আহা, যা জানতে চাইছি তার জবাব দাও। আছে পাসপোর্ট?"

"হ্যাঁ, তা একখানা করিয়েছিলাম বটে। কখন কী কাজে লাগে..."

"গুড। আজই প্রিটোরিয়া স্ট্রিটে ইউনিভার্সাল ট্রাভেলসের

অফিসে চলে যাও। ওদের যতিন মিত্তিরকে আমি বলে রাখছি। চটপট ভিসার অ্যাপ্লিকেশান ঠুকে দাও।”

“কীসের ভিসা স্যার? কোথাকার ভিসা?”

“অস্ট্রেলিয়ার।”

“আমি অস্ট্রেলিয়ার ভিসা নিয়ে কী করব?”

“তুমি তো মহা লেবদুশ হে। ভিসা দিয়ে মানুষ করেটা কী? ভেজে খায়?” জটাধরস্যারের গলায় আলগা ধমক, “তুমি অস্ট্রেলিয়া যাচ্ছ, বুঝেছ? আমার সঙ্গে।”

এমন অযাচিত প্রস্তাবে ঋতমের তো প্রায় ভিরমি খাওয়ার জোগাড়! স্যারের উদ্ভট খামখেয়ালের সঙ্গে তার পরিচয় হয়েছে অল্পবিস্তর। স্যারের লেজ হয়ে সে যেতেও চায় এদিক-ওদিক। এই তো, গত ডিসেম্বরেই আন্দামানের বারাতাং ঘুরে এল। ওখানকার আগ্নেয়গিরি সরেজমিন করালেন জটাধরস্যার। তা, বারাতাং তো দু’হাজার পাঁচেও লাভা বের করেছিল। কিন্তু অস্ট্রেলিয়ায় তো কোনও জ্যান্ত আগ্নেয়গিরি নেই। ওখানকার প্রত্যেকটি আগ্নেয়গিরি লক্ষ লক্ষ বছর আগে নিভে গিয়েছে। শেষ অগ্ন্যুৎপাত হয়েছিল ভারত মহাসাগরের ধারে টাওয়ার হিলে। তাও তো নয় নয় করে পঁচিশ হাজার বছর আগে। সেটাই আবার বেঁচে উঠল নাকি?

আমতা আমতা করে ঋতম বলল, “হঠাৎ অস্ট্রেলিয়ায় কেন স্যার?”

“টু স্টাডি দ্য মিস্ট্রি অফ এ স্ট্রেঞ্জ বুশফায়ার।”

কথাটার মানে বুঝলেও মর্মার্থ মাথায় ঢুকল না ঋতমের। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকল।

“আরে, দাবানল জানো না? মহাভারতের সেই খাণ্ডবদহন? অস্ট্রেলিয়ায় যা ফি-বছর ঘটে থাকে।” সোফায় বসে ওয়ালনাটের বাহারি বাক্স থেকে একখানা জাঁদরেল চুরুট বের করলেন

জটাধরস্যার। ঠোঁটে চেপে তামাকে অগ্নিসংযোগ করতে করতে বললেন, "সম্প্রতি সেখানে একটা অদ্ভুত ধরনের দাবানল ঘটেছে। ভিক্টোরিয়া আর নিউ সাউথওয়েলসের বর্ডারের কাছে। জঙ্গলে আগুন লাগলে অনেক জন্তুজানোয়ার মারা যায়। এই ঘটনাটায় তেমন কোনও ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। তাই ব্যাপারটা খুব বড় করে নিউজে আসেনি। এদিকে আজই সকালে আমি স্ট্রাউসের একটা ই-মেল পেলাম। স্ট্রাউসের ধারণা, ওই আপাত নিরীহ দাবানলটি মোটেই স্বাভাবিক নেচারের নয়। সম্ভবত এর পিছনে কোনও জটিল রহস্য আছে।"

স্ট্রাউস, অর্থাৎ ডক্টর ফ্রেডরিক উইলহেল্‌ম স্ট্রাউস। জাতিতে প্রুশিয়ান, বর্তমানে মেলবোর্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের নামী অধ্যাপক। ভূবিজ্ঞানী হিসেবে ডক্টর স্ট্রাউসের জগৎজোড়া খ্যাতি। উল্কাপাতের সময় পৃথিবীতে ছিটকে আসা পাথর ঘেঁটে সৃষ্টিরহস্য উন্মোচনের নিরন্তর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। জটাধরস্যারের মুখে স্ট্রাউসের বিস্তর গল্প শুনেছে ঋতম। পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর আগে কী অদ্ভুতভাবে লিমা বিমানবন্দরে দু'জনের পরিচয়। তারপর পেরুতে উল্কাখণ্ড নিয়ে দু'জনের একসঙ্গে গবেষণা, একই বিজ্ঞানী দলের সদস্য হয়ে আন্টার্কটিকা ঘুরে আসা, তুচ্ছ বিষয় নিয়ে দু'জনের বাক্‌বিতণ্ডা...। এখনও স্ট্রাউসের সঙ্গে জটাধরস্যারের ভালই যোগাযোগ আছে। মতে মিলুক চাই না মিলুক, প্রুশিয়ান বৈজ্ঞানিকটির চিন্তাভাবনাকে স্যার যে যথেষ্ট গুরুত্ব দেন, তা ঋতম ভালমতোই জানে।

ঋতম জিজ্ঞেস করল, "ডক্টর স্ট্রাউসের কেন এরকম মনে হল স্যার?"

"পুরোটা ও খুলে লেখেনি। শুধু বলছে, ওরকম লোকালাইজড নেচারের বুশফায়ার ঘটা নাকি সম্ভব নয়। তা ছাড়া বছরের এই সময়টায়, আই মিন এপ্রিল-মে মাসে ভিক্টোরিয়া নিউ

সাউথওয়েলসের দিকে দাবানল হওয়াটাই তো যথেষ্ট আশ্চর্যনজক।"

"ঠিকই তো স্যার। ওই অঞ্চলে বুশফায়ার তো হয় ডিসেম্বর-জানুয়ারিতে।"

"কারেক্ট। ওদের যখন গ্রীষ্মকাল। কিন্তু এখন তো ওখানে শীত আসছে...।" জটাধরস্যার গলগল ধোঁয়া ছাড়লেন, "আর সেইজন্যই বোধহয় স্ট্রাউস ভীষণভাবে চাইছে, আমিও যেন গিয়ে ব্যাপারটা দেখি। তাই ঠিক করলাম অস্ট্রেলিয়ার সাউথ-ইস্ট কর্নারটায় তো যাওয়া হয়নি, এই সুযোগে একবার ঢুঁ মেরে আসি। বুঝতেই পারছ, স্ট্রাউসের যখন অস্বাভাবিক ঠেকেছে, তখন মগজের ভালই খোরাক জুটবে।"

"কিন্তু স্যার, আমি গিয়ে কী করব?" ঋতম ঢোক গিলল, "দাবানল তো আমার সাবজেক্ট নয়।"

"আজব কথা! বিজ্ঞানকে ওভাবে সাবজেক্টের খোপে ভাগ করা যায় নাকি? বিজ্ঞানীর কাজ প্রাকৃতিক মিস্ট্রি দেখলেই হাঁ হাঁ করে ঝাঁপিয়ে পড়া। প্রকৃতিতে কিছুই অকারণে ঘটে না। দুম করে একটা অনিয়ম কেন ঘটল তা খোঁজার আগ্রহ না থাকলে তো বিজ্ঞান পড়াই বৃথা।"

জটাধরস্যারকে এই ক'মাসে ঋতম যা চিনেছে তাতে এই কথাটাই স্বাভাবিক। বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখাতেই তাঁর অবাধ ঘোরাফেরা। শুধু বিজ্ঞান নয়, ইতিহাস, ভূগোলেও তাঁর সমান উৎসাহ। সাহিত্যেও। কিন্তু স্যারের সঙ্গে পাল্লা টানা কি সব সময় সম্ভব ঋতমের পক্ষে? তাকে তো অনেক কিছু ভাবতে হবে, হিসেব করে চলতে হয়...। জ্ঞানপিপাসা তারও আছে, কিন্তু সাধ্যের কথা ভুললে চলবে কেন।

লজ্জা লজ্জা মুখে ঋতম বলল, "তবু স্যার... অদূর যাতায়াত...।"

"বুঝেছি।" জটাধরস্যার মুচকি হাসলেন, "খরচখরচার চিন্তা।"

"হ্যাঁ মানে...।"

"আমি যখন তোমায় যেতে বলছি, তখন তোমার দায়িত্ব তো আমার। নয় কি? আজই আমি স্ট্রাউসকে তোমার কথা জানিয়ে দিচ্ছি। তুমি শুধু ভিসাটা বানিয়ে ফেলো।"

আহ্লাদে আটখানা ঋতম প্রায় নেচে উঠতে যাচ্ছিল, তার আগেই ছন্দপতন। দুপদাপিয়ে ঘরে ঢুকলেন শ্রীমতী রত্নমালা জোয়ারদার। প্রোফেসর জটাধর জোয়ারদারের জাঁদরেল গৃহিণী। একঝলক ঋতমকে দেখলেন রত্নমালা, পরের ঝলকে জটাধরকে। তারপরই ঝনঝন বেজে উঠলেন, "সাতসকালে ছেলেটাকে ডেকে এনে কী মতলব আঁটা হচ্ছে, অ্যাঁ?"

দৈর্ঘ্য-প্রস্থে বিশাল গিন্নিটি চড়া সুরে কিছু বললে জটাধরস্যারের হৃৎকম্প হয়। মিনমিনে গলায় বললেন, "আমরা... একটু... মেলবোর্নে...।"

"যাচ্ছ? কবে?"

"এই তো, পারলে নেক্সট উইকেই...।"

"অ। আর আমি বুঝি এখানে একা পড়ে থাকব?"

"বেঙ্গালুরু চলে যাও। ছেলের কাছে।"

"বয়ে গিয়েছে। আমাকে ফেলে তুমি অনেক একা একা ঘুরেছ। এবার আমি সঙ্গে যাবই।"

"তুমি গিয়ে কী করবে? আমরা যাচ্ছি একটা সায়েন্টিফিক এক্সপিডিশনে। কাজেকর্মে ব্যস্ত থাকা।"

"আমিও ইচ্ছেমতো ঘুরব ফিরব।" রত্নমালা ফিক করে হাসলেন, "চাইলে তোমাদের সাহায্যও করতে পারি।"

ঋতমের জিভে প্রশ্ন এসে গিয়েছিল, তার আগে জটাধরস্যারই বলে উঠলেন, "তুমি? সাহায্য?"

"ইয়েস। ভুলে যেয়ো না, আমি কিন্তু স্কুলে সায়েন্স নিয়ে পড়েছিলাম।"

"তো?"

'হেলাফেলা কোরো না স্যার! সীতাকে উদ্ধারের সময় কাঠবিড়ালিকেও কিন্তু কাজে লেগেছিল।"

"সে তো গন্ধমাদন পর্বতও...।"

জটাধরস্যার মাঝপথেই গিলে নিলেন কথাটা। তবে রত্নমালার কান এড়ায়নি। কটমট চোখে তাকালেন, "তুমি কি আমার চেহারা নিয়ে কিছু ইঙ্গিত করলে?"

"না, না, তাই কি পারি?" গিন্নির বিশাল বপুটি চোরা দৃষ্টিতে দেখে নিয়ে জটাধরস্যার সন্ত্রস্ত স্বরে বললেন, "যাওয়ার সাধ যখন জেগেছে, তোমায় কে ঠেকায়! যাও, গোছগাছ শুরু করে দাও।"

এগারো দিনের মাথায় মিলল ভিসা। তার পাঁচদিন পরে উড়ান। ষোলোটা দিন যে কীভাবে কেটে গেল ঋতম যেন টেরই পেল না।

প্লেনে চড়ার আগে প্রোফেসর জোয়ারদার হাসতে হাসতে বলেছিলেন, "অনেক বুদ্ধু সাহেব ভারতে এসেই পথেঘাটে বাঘ-হাতি আর সাপ দেখতে চায়। তুমি কিন্তু ওখানে নেমেই রাস্তায় ক্যাঙারু খুঁজো না। অবশ্য অস্ট্রেলিয়ায় এখন অঢেল ক্যাঙারু। ঠিক ঠিক জায়গায় যথাসময়ে তাদের দর্শন পাবে। কপালে থাকলে বনেবাদাড়ে খুদে ভল্লুক কোয়ালার দেখা মেলাও অসম্ভব নয়। কিংবা শিয়াল-শিয়াল চেহারার ডিংগোর।"

অবশ্য ঠাট্টাটা যে ঠাট্টাই, তা ঋতম ভালমতোই জানে। তবে ভিতরে ভিতরে একটা উত্তেজনা তো হচ্ছেই। জীবনে প্রথম বিদেশযাত্রা বলে কথা! তাও আবার পৃথিবীর এক গোলার্ধ থেকে অন্য গোলার্ধে। পাক্কা সাড়ে তিন ঘণ্টা সিঙ্গাপুর এয়ারপোর্টে অপেক্ষা করে, দু'দফায় মোট এগারো ঘণ্টা আকাশে উড়ে যখন শেষ

বিকেলে মেলবোর্নে পৌঁছোল, উত্তেজনাটা তখনও পুরোপুরি থিতোয়নি।

এদিকে বিমানবন্দর থেকে বেরোতে গিয়ে নতুন এক টেনশন শুরু হয়েছে। ঋতমের নয়, রত্নমালার। জটাধরস্যারের বারণকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে সঙ্গে বিস্তর লটবহর নিয়েছেন রত্নমালা। তাঁর ঢাউস ঢাউস সুটকেস, হ্যান্ড-লাগেজ আর ভ্যানিটিব্যাগের খোপে খোপে অজস্র বিটকেল দ্রব্যও মজুত। ঠোঙায় ভরা সুপুরি, ভাজা মউরি, লেবু-বিটনুনে মজানো জোয়ান, আমলকী আরও কত কী যে। কিন্তু এখন নেমেই ফাঁপরে পড়েছেন। ঠিকঠাক প্যাকেট করা না থাকলে ওইসব জিনিস নাকি অস্ট্রেলিয়ায় ঢোকানো যাবে না। বিমানবন্দরে যেসব গন্ধবিশারদ কুকুররা ঘুরে বেড়ায়, তারা একবার টের পেলেই ক্যাঁক। জিনিস কেড়ে নিয়ে নিরাপত্তারক্ষীরাও সঙ্গে সঙ্গে তা চালান করে দেবে কোরানটাইনে। ব্যস, হাপিশ হয়ে যাবে রত্নমালার সাধের সুপুরি-মউরি-জোয়ান-আমলকী। আর সারাদিন যদি কচরমচর ওগুলো চিবোতে না পারেন, তা হলে তো রত্নমালার অস্ট্রেলিয়া বেড়ানোর অর্ধেক আনন্দই মাটি।

অনেক বছর আগে ইংল্যান্ড থেকে মিসেস প্যাটারসন নামের এক মহিলা কী একটা সর্বনেশে বীজ নিয়ে গিয়েছিলেন অস্ট্রেলিয়ায়। সেই বীজ থেকে ঝোপঝাড় গজিয়ে নাকি নানা রোগ ছড়িয়েছে ও দেশে। অস্ট্রেলিয়ানরা ওই জংলা গাছগুলোকে বলে 'মিসেস প্যাটারসনের অভিশাপ'। পাছে আবার ওই ধরনের কিছু অস্ট্রেলিয়ায় ঢুকে পড়ে, তাই নাকি এত সাবধানতা।

তা শেষমেশ অবশ্য অশান্তিতে পড়তে হল না রত্নমালাকে। বিমানবন্দরে আজ একটিও স্নিকার ডগ নেই। বোধহয় রত্নমালা জোয়ারদার আসছেন শুনেই তারা ভয়ে গা ঢাকা দিয়েছে।

ছোটখাটো লাউঞ্জটায় এসেই রত্নমালা স্বমূর্তিতে ফিরলেন।

দাপুটে গলায় বললেন, "দেখেছ তো, কেমন গটগটিয়ে বেরিয়ে এলাম!"

জটাধরস্যার গোমড়া হয়ে গিয়েছেন। এই ধরনের ছেলেমানুষি ব্যাপার-স্যাপার তাঁর বিলকুল না-পসন্দ। জবাব না দিয়ে তাকাচ্ছেন ইতিউতি, খুঁজছেন বন্ধুকে।

আচমকা যে মানুষটি এসে জটাধরস্যারকে জড়িয়ে ধরলেন, তাঁকে দেখে ঋতম থ'। মেরেকেটে পাঁচ ফুট তিন ইঞ্চি, এত রোগা যে গায়ে কোটখানা লটরপটর করছে। শুকনো লিচুর মতো মুখ, থুতনিতে ঝুলছে টুকরো দাড়ি। গায়ের রং টুকটুকে লাল না হলে সাহেব বলে মনেই হত না। ইনিই সেই প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ফ্রেডরিক উইলহেল্‌ম স্ট্রাউস? ওইটুকু চেহারায় অত ভারী একটা নামের বোঝা বইছেন কী করে!

এবার উচ্ছ্বাস বিনিময়ের পালা, "হ্যালো ফ্রেড, কদ্দিন পর দেখা হল বলো তো?"

"ইলেভেন লং ইয়ার্স। সেই লাস্ট আন্টার্কটিকা গিয়েছিলাম। ...এনিওয়ে, হাউ ওয়াজ দ্য জার্নি টুডে?"

"এক্সেলেন্ট। আমি এখন টগবগ করে ফুটছি। হঠাৎ যেন বয়স অনেক কমে গিয়েছে।"

ঋতম আর রত্নমালার সঙ্গেও আলাপ-পরিচয়ের পালা সাঙ্গ হল। আপ্যায়ন করে ঋতমদের বিমানবন্দরের বাইরে নিয়ে গেলেন স্ট্রাউস। ভালই ঠান্ডা রয়েছে মেলবোর্নে, সঙ্গে একটা কনকনে হাওয়াও চলছে। হাতে-ধরা সোয়েটারটা ঝটপট গায়ে চড়িয়ে নিল ঋতম। রত্নমালাও আষ্টেপৃষ্ঠে শাল জড়িয়ে নিয়েছেন গায়ে। তাতেও আরাম নেই, কাঁপছেন হিহি। পার্কিং লটে পৌঁছে শীতাতপনিয়ন্ত্রিত গাড়িতে উঠে পড়ার পর শান্তি।

গাড়ি স্টার্ট দিয়ে স্ট্রাউস বলে উঠলেন, "এহে জে জে, একটা বড় ভুল হয়ে গেল যে!"

জটাধরস্যার বসেছেন স্ট্রাউসের পাশটিতে। ঘাড় হেলিয়ে বললেন, "কীরকম?"

"এয়ারপোর্টে আমাদের কফি খাওয়া হল না তো?"

"এয়ারপোর্টে কফি? তোমার সঙ্গে? আবার?" জটাধরস্যার হাহা হেসে উঠলেন, "মনে পড়ে, লিমায় কী কাণ্ডটা ঘটিয়েছিলে?"

"ভোলা কি যায়? যতবার কফি অর্ডার করি, ওয়েটার একটা বিশ্রী সুপ এনে দেয়। ভাগ্যিস তুমি সেদিন ছিলে, নইলে আমার আর কফি জুটত না।"

"ভুলভাল ল্যাঙ্গোয়েজে বললে ওরকমই হয়। অবশ্য ওই ঘটনা থেকে আমাদের আলাপটাও হয়ে গেল।"

জটাধরস্যার আর স্ট্রাউসের বাক্যালাপের মাঝে ঘড়ির কাঁটা ঘুরিয়ে নিল ঋতম। সিঙ্গাপুরে সময়টা বদলানো হয়নি। কলকাতা থেকে এখন সাড়ে চার ঘণ্টা এগিয়ে আছে তারা। হবেই তো, দ্রাঘিমারেখা যে ষাট ডিগ্রি পুবে সরে গিয়েছে।

কথা বলতে বলতে হঠাৎ স্ট্রাউসের ঘাড় ঘুরল। পিছনের সিটে আসীন রত্নমালাকে বললেন, "কী ম্যাডাম, কেমন লাগছে শহরটা?"

রত্নমালার ঢুলুঢুলু চোখ জানলার কাচের ওপারে। মাথা দুলিয়ে বললেন, "খাসা! কী চমৎকার রাস্তাঘাট, গাড়িগুলো কেমন নিয়ম মেনে সার বেঁধে চলেছে, প্যাঁ পোঁ করছে না...।"

জটাধরস্যার বললেন, "এসব দেশে হর্ন বাজানোর রীতি নেই। এরা অকারণ শব্দ করাকে অসভ্যতা মনে করে।"

"আর-একটা ব্যাপারও কিন্তু নতুন লাগছে স্যার!" ঋতম না বলে পারল না, "ট্রাকগুলোর এগ্‌জস্ট পাইপ কেমন আকাশমুখো!"

"ওতে পলিউশন লেভেলটা কম থাকে। মানুষকে সরাসরি কার্বন মনোক্সাইড গিলতে হয় না।"

"আমাদের দেশের ট্রাকে-বাসেও তো এই সিস্টেম করে ফেলা যায় স্যার?"

"করাই যায়। হয়তো ভবিষ্যতে হবে। পিছিয়ে পড়া দেশে সব ভাল প্রযুক্তিই তো পরে আসে।"

ঋতমের মনটা একটু খারাপই হয়ে গেল। পৃথিবীতে কিছু কিছু দেশ এত ধনী, আবার কোনও কোনও দেশ কেন যে এত গরিব? সবটাই কি কপাল? নাকি মানসিকতারও দৈন্য আছে? অবশ্য সাদা চামড়ার লোকরা যে লুঠপাট চালিয়েও অনেকটা বড়লোক হয়েছে, এতেও তো কোনও সন্দেহ নেই। জনসংখ্যার সমস্যাও তো পিছিয়ে থাকার একটা কারণ বটে।

ভাবনার মাঝেই একটি লম্বা-চওড়া ব্রিজে উঠে পড়ল গাড়ি। ডাইনে অজস্র কারখানা, দূরে মেলবোর্ন বন্দরের আলো, বাঁয়ে সার সার বহুতল অট্টালিকার শোভা। একটু পরে গাড়ি ঢুকে পড়ল এক টানেলে। আলো ঝলমল সুড়ঙ্গটার উপর দিয়ে নাকি বয়ে চলেছে ইয়ারা নদী। এই নদীর দু'পারেই গড়ে উঠেছে মেলবোর্ন শহর।

নিসর্গ দর্শনে জটাধরস্যারের মন নেই। ভারিক্কি গলায় বললেন, "তুমি কিন্তু এখনও কাজের কথাটা শুরু করোনি ফ্রেড।"

"হচ্ছে, হচ্ছে! তাড়া কীসের। আমার বাড়িতে গিয়ে খেয়েদেয়ে ভাল করে ঘুম দাও আগে। বায়োক্লকটাকে অ্যাডজাস্ট করে নাও।"

"ঘটনাটা ডিটেলে না শুনলে আমার ঘুম আসবেই না।"

"তোমার এনার্জি আছে বটে! হাহা।" স্ট্রাউস প্রাণ খুলে হাসলেন, "বলো, কী জানতে চাও?"

"মেন ইনসিডেন্টটাই তো এখনও ক্লিয়ার নয়। আই মিন, বুশফায়ার।"

"আগুনটা লেগেছিল আঠারো এপ্রিল। অ্যারাউন্ড রাত এগারোটায়। জায়গাটা মেলবোর্ন থেকে প্রায় পাঁচশো কিলোমিটার।

এই ভিক্টোরিয়া প্রদেশের মধ্যেই। তবে ওখান থেকে ক্যাপিটাল টেরিটরি বা নিউ সাউথওয়েল্‌স খুব দূরে নয়। অক্ষরেখা, ধরো গিয়ে সাঁইত্রিশ ডিগ্রি সাউথ। দ্রাঘিমারেখা একশো একান্ন ডিগ্রি ইস্ট। মাত্র সওয়া ঘণ্টা মতো স্থায়ী হয়েছিল আগুনটা। তাও শুধু আট হেক্টর জায়গায়।"

"এমন কি ঘটতে পারে না ফ্রেড?"

"ন্যাচারালি ঘটা সম্ভব নয়। কারণ, সেদিন ওই সময় ওই স্পটে টেম্পারেচার ছিল চোদ্দো ডিগ্রি সেলসিয়াস। বাতাস তেমন শুকনোও ছিল না। প্লাস, গাছগুলো এমনভাবে পুড়েছে... সেটাও অকল্পনীয়।"

"কীরকম?"

"সে ভারী পিকিউলিয়ার ফর্ম। তুমি স্বচক্ষে দেখলে বুঝবে।"

ডক্টর স্ট্রাউসের বাড়ি মেলবোর্ন শহরের উপকণ্ঠে। জায়গাটার নাম মনাশ, পাড়ার নাম গ্লেন ওয়েভারলি। বিয়ে-থা করেননি স্ট্রাউস। একাই থাকেন আগাপাশতলা কার্পেটমোড়া কটেজ প্যাটার্নের ছিমছাম দোতলা বাড়িতে। উঁহুঁ, পুরো একা নন, স্ট্রাউসের একজন সঙ্গী আছে। হেক্টর। একটি কুচকুচে কালো ল্যাব্রাডর। কুকুরটির চেহারাটি ভয়ংকর, কিন্তু সে ভারী শান্ত। বাধ্যও।

স্ট্রাউসের ঘরদোর যথেষ্ট সাজানো গোছানো। মোটেই জটাধরস্যারের মতো আলাভোলা বৈজ্ঞানিক নন স্ট্রাউস। ঘরোয়া কাজকর্মে তিনি দিব্যি নিপুণ। অতিথিদের জন্য নিজের হাতে খানা বানিয়ে রেখেছিলেন। স্প্যাগেটি আর কিমা দিয়ে তৈরি বোলোনেজ, সসেজ ছড়ানো পট্যাটো স্যালাড, আর ভেড়ার মাংসের স্টু। একপেট খেয়ে ঋতম যখন ডাইনিং টেবিল ছাড়ল, দু'চোখ ঘুমে জড়িয়ে এসেছে।

একে পথশ্রমের ক্লান্তি, তায় জেটল্যাগ, রাতে ঘুমটাও হল

জব্বর। নিদ্রাভঙ্গ হতেই ঋতম প্রায় আঁতকে উঠেছে। বেলা এগারোটা! তার মানে টানা বারো ঘণ্টা নাক ডাকিয়েছে! সে কি কুম্ভকর্ণ?

চটপট মুখটুখ ধুয়ে ঘরের বাইরে এসে ঋতম টের পেল, বাড়িটা অস্বাভাবিক রকমের নিঝুম। কাউকে দেখাও যাচ্ছে না, কোথাও কোনও শব্দও নেই। প্রোফেসর জটাধর আর রত্নমালার ঘরখানা হাট করে খোলা। ওপাশে স্ট্রাউসের কামরা থেকেও কোনও আওয়াজ আসছে না!

একতলায় নেমে স্বস্তি মিলল। খাওয়ার টেবিলে রত্নমালা। খানিক তফাতে হেক্টর। রত্নমালার সামনে খাবারের পাহাড়। ক্রোঁসো, চিজ, মাখন, সালামি, হ্যাম, ডিমসেদ্ধ, ফ্রুট জুস, থরে থরে সাজানো। সুদৃশ্য ক্রিস্টাল বোল-এ গাদা গাদা ফলও মজুত। কলা, আপেল, কমলালেবু, স্ট্রবেরি, আঙুর...।

কিন্তু কী আশ্চর্য, এত খাদ্যের মাঝেও ভোজনবিলাসী রত্নমালা হাত গুটিয়ে বসে। কাঠ কাঠ ভঙ্গিতে। মাঝে মাঝে আড়চোখে তাকাচ্ছেন হেক্টরের দিকে, পরক্ষণে ফের টানটান।

ঋতমকে দেখেই রত্নমালা হাউমাউ করে উঠলেন, "কী কাণ্ড বলো তো! তোমার স্যার আমাকে এমন বিপদের মুখে ফেলে রেখে চলে গেলেন?"

"কীসের বিপদ?"

"ওই যে.. হেক্টর। আমি যেই নীচে নেমেছি, ওমনি পিছন পিছন এসে গিয়েছে। দেখো না দেখো, কেমন কটমট তাকাচ্ছে।"

"না না ম্যাডাম, ও খুব ভাল!" ঋতম ঝুঁকে হেক্টরের পিঠে হাত বুলিয়ে দিল, "ও কিচ্ছু করবে না!"

"বললেই হল? বারবার আমায় শুঁকে যাচ্ছে। আর একটু নড়লেই ঘঁক।"

"ওটা ওর খেলা। আপনি ভয় পাচ্ছেন তো, তাই ও মজা পাচ্ছে।"

"নিকুচি করেছে অমন মজার!" ঝেঁঝে উঠতে গিয়েও রত্নমালা গলা নামিয়ে নিলেন। গোমড়া মুখে বললেন, "স্ট্রাউস এরকম একটা দানব পুষে রেখেছেন জানলে আমি থোড়াই আসতাম।"

ঋতম কোনওক্রমে হাসি চাপল। কাল রাতেই হেক্টরকে দেখে কেমন সিঁটিয়ে গিয়েছিলেন রত্নমালা। কিন্তু তিনি যে কুকুরকে এতটা ভয় পান, বুঝতে পারেনি। যাক, ম্যাডামের একটা উইকপয়েন্ট অন্তত জানা গেল।

ভালমানুষের মতো মুখ করে একটা চেয়ার টেনে বসল ঋতম। গ্লাসে ফলের রস ঢালতে ঢালতে বলল, "স্যাররা কোথায় বেরোলেন?"

"বলল তো কাছেই যাচ্ছে, এক্ষুনি চলে আসবে।" ঋতমের উপস্থিতিতে আস্তে আস্তে সহজ হচ্ছেন রত্নমালা। আর একবার হেক্টরকে টেরিয়ে দেখে একটা ক্রোঁসো তুললেন হাতে। কামড় বসিয়ে বললেন, "ওরা ফিরলে তুমি কিন্তু আমার সঙ্গে একবার মার্কেটে যাবে।"

"কেন ম্যাডাম?"

"সারাক্ষণ এইসব সাহেবি খানা আমার পোষাবে না। মাছ কিনে আনব। রাতে মাছের ঝোল, ভাত খাব।"

"এখানে কি আপনার পছন্দসই মাছ পাবেন?"

"খুঁজে দেখতে হবে। না পেলে যা মিলবে, তাই এনে রাঁধব।... আর শোনো, তোমার স্যারের তো আক্কেল বলে কিছু নেই! অতএব তোমাকেই দায়িত্বটা নিতে হবে।"

"কী দায়িত্ব ম্যাডাম?"

"মেলবোর্ন শহর আর তার আশপাশে কী কী দেখার জায়গা

আছে তার খোঁজ নাও। তোমার স্যারের তো সময় হবে না! তুমিই আমাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সব দেখাবে।"

ঋতম ঈষৎ ফাঁপরে পড়ে গেল। জটাধরস্যার কিংবা স্ট্রাউস না থাকলে তো গাড়ি মিলবে না। যদি বা মেলে, সে গাড়ি চালাবে কে? আর গাড়ি ছাড়া বাস কিংবা ট্রেনের ভরসায় কীভাবে ম্যাডামকে নিয়ে ঘুরবে ঋতম? এখানকার কিছুই তো সে চেনে না!

ভাবনার মাঝেই রত্নমালার পরবর্তী নির্দেশ, "তোমাকে আর একটা কাজও করতে হবে।"

ঋতম ঢোক গিলল, "কী ম্যাডাম?"

"এখানে কী কী স্পেশ্যাল জিনিস পাওয়া যায় তার ফর্দ বানাও। কোথায় কোনটা পাওয়া যাবে জেনে নাও ভাল করে। তারপর আমার সঙ্গে শপিং-এ বেরোবে।"

হুকুমের তোড়ে ঋতমের ত্রাহি ত্রাহি দশা। আর বসে থাকতে সাহস হচ্ছে না। তড়িঘড়ি খাওয়া সেরে উঠে দাঁড়াল। কাঁচুমাচু মুখে বলল, "আমি একটু বাইরে থেকে ঘুরে আসি?"

"কোথায় যাবে?"

"এই.. একটু চারদিকটা দেখব... হাঁটাহাঁটি করব... নতুন জায়গা!"

"আমাকে একা ফেলে?" রত্নমালার দৃষ্টি হঠাৎই করুণ, "আমাকে ওই কুকুরটার মুখে ছেড়ে...।"

সমস্যার সমাধান অবশ্য করে ফেলল ঋতম। রত্নমালাকে পৌঁছে দিল দোতলায়। দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিলেন রত্নমালা। ঋতমও উড়তে উড়তে সোজা রাস্তায়।

বাইরে এসে ঋতমের বুকটা ভাল লাগায় ভরে গেল। মাথার উপর ঝকমকে নীল আকাশ। এত ঘন নীল, চোখ যেন ধাঁধিয়ে যায়। বাতাসে ধুলোবালির চিহ্নমাত্র নেই। শুদ্ধ অক্সিজেন পৌঁছে যাচ্ছে ফুসফুসে। কোথায় একটা পাখি ডেকে উঠল। চেনা চেনা ডাক। যেন

কাকের সঙ্গে খুব মিল। ম্যাগপাই কি? সাদা দাগ টানা অস্ট্রেলিয়ার কাক? মুখ তুলে পাখিটাকে এদিক-ওদিক খুঁজল ঋতম। চারদিক সবুজে সবুজ, অজস্র গাছপালায় ছেয়ে আছে পাড়া। এর মধ্যে থেকে একটা পাখি খুঁজে বের করা কি সোজা কাজ? দু'-চার মিনিট চেষ্টা করে ঋতম হাল ছেড়ে দিল। ধীর পায়ে হাঁটছে রাস্তা ধরে। দু'পাশে পরপর বাড়ি, কিন্তু কোনও মানুষের গলা পাওয়া যাচ্ছে না। পথেঘাটে লোকও দেখা যাচ্ছে না তেমন। শুধু হঠাৎ হঠাৎ হুস করে কোনও গাড়ি বেরিয়ে যাচ্ছে পাশ দিয়ে। কলকাতার ভিড় থেকে এসে এত নির্জনতায় কেমন যেন গা শিরশির করে।

ঘণ্টাখানেক এলোমেলো ঘুরে ফিরল ঋতম। জটাধরস্যার আর স্ট্রাউস এসে গিয়েছেন। ঋতমকে দেখে স্ট্রাউস হইহই করে উঠলেন, "কোথায় বেড়াচ্ছিলে, ইয়াংম্যান?"

উৎফুল্ল স্বরে ঋতম বলল, "এমনিই হাঁটছিলাম। এখানকার ওয়েদারটা কী চমৎকার, আহা! ঠান্ডা আছে, তবে হাইলি এনজয়েবল।"

"ইউ আর লাকি, মেলবোর্নের স্পেশ্যাল শীতটা আজ নেই।" স্ট্রাউস চোখ পিটপিট করলেন, "এখানে কিছুদিন থাকলে মেলবোর্নের ওয়েদারের স্পেশ্যালিটিটা তুমি টের পেতে।"

"কীরকম স্যার?"

"এখানে একই দিনে চারটে ঋতু খেলে বেড়ায়। এই দেখছ পরিষ্কার আকাশ, হঠাৎ দেখবে মেঘলা হয়ে গিয়েছে। এই ঝনঝন রোদ্দুর, তো এই ঝিরঝির বৃষ্টি। আবার হয়তো ঝুপ করে বৃষ্টি থেমে নরম বসন্তের হাওয়া বইতে শুরু করল।"

জটাধরস্যার হাসতে হাসতে বললেন, "এক কথায় বলো না বাপু! দক্ষিণ মেরু বাতাস পাঠালে তোমরা ঠকঠক কাঁপো, আর উত্তরের মরুভূমি থেকে হাওয়া ধেয়ে এলে গরমে ভাজা ভাজা হও।"

ঋতমের মাথায় হঠাৎই একটা প্রশ্ন জাগল। ভুরু কুঁচকে বলল, "একটা কথা জিজ্ঞেস করব স্যার?"

"বলো।"

"এমনও তো হতে পারে, মরুভূমি থেকে আচমকা বাতাস এসেই বুশফায়ারটা ঘটিয়েছিল?"

"নাঃ। শীতের মুখে সেটা সম্ভব নয়।"

"আচ্ছা, অস্ট্রেলিয়ায় তো এলনিনোরও প্রভাব আছে। তার ফলেও তো গরম বাতাস...।"

"ঠিকই বলেছ। প্রশান্ত মহাসাগরের জলের তাপমাত্রা হঠাৎ বেড়ে গিয়ে ওই বিদঘুটে বাতাস অস্ট্রেলিয়ার দিকে ছুটে আসে বটে। কিন্তু আমরা হিসেব করে দেখলাম, বছর দেড়েক আগে অস্ট্রেলিয়ায় এলনিনোর উপদ্রব শেষ হয়েছে। এবং এত তাড়াতাড়ি তার ফিরে আসার কোনও আশঙ্কাই নেই।"

"অন্য লাইনে ভাবতে হবে, বুঝেছ।" জটাধরস্যার গলা ঝাড়লেন, "যাক গে, এবার কাজের কথাটা শোনো। কাল সকালেই কিন্তু আমাদের অভিযান শুরু। সো গেট রেডি ফর দ্য জার্নি।"

রত্নমালা স্নান সেরে নামছেন ড্রয়িংহলে। জটাধরস্যারের কথা কানে যেতেই বলে উঠলেন, "সে কী, কালই জঙ্গলে ছুটতে হবে? আমি আর ঋতম যে অন্য প্ল্যান করছিলাম? ক'দিন একটু মেলবোর্নের এপাশে ওপাশে...।"

"আজ বেরোতে পারি।" স্ট্রাউস উৎসাহিত মুখে বললেন, "এখন তো সবে দুপুর, সারাটা দিনই তো আমাদের হাতে।"

"কোথায় যাবেন?"

"উঁহু, আগে বলব না।" স্ট্রাউস মুচকি মুচকি হাসছেন, "ওটা সাসপেন্স থাক।"

বেরোতে বেরোতে বেলা তিনটে। শহর ছাড়িয়ে স্ট্রাউসের গাড়ি

চলেছে খাড়া দক্ষিণে। পথের দু'ধারে সবুজ প্রান্তর, চলে বেড়াচ্ছে পাল পাল ভেড়া। দিগন্তরেখার নীল এসে মিশেছে সবুজে। মাঝে মাঝেই পড়ে আঙুরখেত। সঙ্গে ওয়াইনারি। দৃশ্যপট এত শান্ত, দেখে যেন চোখ জুড়িয়ে যায়।

স্টিয়ারিং-এ বসে স্ট্রাউস গান ধরেছেন গুনগুন। হঠাৎই চোখ নাচিয়ে জটাধরস্যারকে জিজ্ঞেস করলেন, "কোথায় যাচ্ছি আন্দাজ করতে পারো?"

"মনে তো হচ্ছে ফিলিপ আইল্যান্ড।"

"একদম ঠিক। ম্যাডামকে পেঙ্গুইনদের রাজ্যে নিয়ে যাচ্ছি।"

রত্নমালা অবাক মুখে বললেন, "অস্ট্রেলিয়ায় পেঙ্গুইন আছে নাকি?"

"ফিলিপ আইল্যান্ডে আছে। ছোট ছোট ফেয়ারি পেঙ্গুইন। দলবেঁধে থাকে একটা জায়গায়, আলাদা আলাদা বাসা বেঁধে। সেই কাকভোরে সূর্য ওঠার আগে, সমুদ্রে চলে যায়। খাবারদাবার জোগাড় করতে। ফেরে সন্ধের মুখে মুখে। মে মাসে মোটামুটি সাড়ে পাঁচটা ওদের ফেরার টাইম। আশা করি তার আগেই আমরা পৌঁছে যাব। ওদের বাসায় ফেরাটা কিন্তু দেখার মতো দৃশ্য।"

রত্নমালা উত্তেজনায় ফুটতে শুরু করেছেন। জটাধরস্যার সাবধান করে দিয়ে বললেন, "নামার আগে কার্ডিগান, শাল সব গায়ে চাপিয়ে নিয়ো। ওখানে কিন্তু সাংঘাতিক ঠান্ডা।"

"হ্যাঁ, ফিলিপ আইল্যান্ডের কনকনে বাতাসকে একটু সমঝে চলা উচিত। সোজা দক্ষিণ মেরু থেকে আসছে তো! হাড়-মজ্জা পর্যন্ত কাঁপিয়ে দেয়।" স্ট্রাউস মাথা দোলালেন, "সাধে কি ব্রিটিশরা ওখান থেকে পালিয়েছিল।"

ঋতম জিজ্ঞেস করল, "ওখানে বুঝি আর মানুষজন থাকে না?"

"বসতি আছে। জনসংখ্যা কম। ক্যাপ্টেন কুক অস্ট্রেলিয়া

সেই দেড়শো বছর আগের মতো করে সাজিয়ে রাখা আছে। সেই স্বর্ণখনি, আচমকা প্রথম সোনার খোঁজ পাওয়া, তখনকার দিনের পোশাক পরা লোকজন দোকানপাট... দেখলে ভালই লাগবে।"

রত্নমালা হতাশ স্বরে বললেন, "কিন্তু সোনা তো পাব না।"

"তাও পেতে পারেন। ওখানে একটা সরু জলের ধারা আছে। খনি থেমে নেমেছে ধারাটা। জলের নীচে পাথর-বালি ঘেঁটে ঘেঁটে এখনও দু'-এককুচি সোনা মেলে বই কী।"

"তুমি আর পাগলের সামনে সাঁকো নাড়ানোর কথা তুলো না ফ্রেড। কাজকর্ম মাথায় উঠবে তা হলে। সব্বাইকে ওই ব্যালারাটে গিয়ে বেলচা-ছাঁকনি নিয়ে বসে থাকতে হবে।"

আবার হো হো হাসি। রত্নমালা গুম। আর এভাবেই ঠাট্টাতামাশা, গল্পগুজবের মাঝে গাড়ি কখন ফিলিপ আইল্যান্ডে হাজির। পাঁচটা বেজে গিয়েছে। হাতে বেশি সময় নেই, টিকিট কেটে সকলে মিলে ছুটলেন পেঙ্গুইন গ্যালারিতে। হিহি কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়লেন সিমেন্টের আসনে।

পেঙ্গুইনদের দর্শন পাওয়া গেল পাঁচটা পঁয়ত্রিশে। সূর্য তখন ডুবুডুবু। সমুদ্রের ঢেউয়ে দোল খেতে খেতে আসছে ঝাঁকে ঝাঁকে। প্রথমে দলের এক কর্তা পারে উঠে ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নিরীক্ষণ করল চারদিক। ফের জলে লাফিয়ে কী সিগনাল দিল কে জানে, বাকিরা বেরিয়ে এল টুপ টুপ। আবার একটা দল এল। আবার একটা দল। লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল কিছুক্ষণ, তারপর খুদে উকিলবাবুরা দুলে দুলে চললেন যে-যার ঘর পানে। অবশ্য শান্তিতে আর যেতে পারে কই! দুষ্টু সিগালের পাল উড়ছে মাথার উপর, নানানভাবে বিরক্ত করছে বেচারাদের। উদ্দেশ্য একটাই, যদি কেউ ঘাবড়ে গিয়ে পেট বোঝাই মাছ থেকে কিছু উগরে দেয়।

দেখতে দেখতে আধো অন্ধকার সমুদ্রপার পেঙ্গুইনবাবুদের

সেই দেড়শো বছর আগের মতো করে সাজিয়ে রাখা আছে। সেই স্বর্ণখনি, আচমকা প্রথম সোনার খোঁজ পাওয়া, তখনকার দিনের পোশাক পরা লোকজন দোকানপাট... দেখলে ভালই লাগবে।"

রত্নমালা হতাশ স্বরে বললেন, "কিন্তু সোনা তো পাব না।"

"তাও পেতে পারেন। ওখানে একটা সরু জলের ধারা আছে। খনি থেমে নেমেছে ধারাটা। জলের নীচে পাথর-বালি ঘেঁটে ঘেঁটে এখনও দু'-এককুচি সোনা মেলে বই কী।"

"তুমি আর পাগলের সামনে সাঁকো নাড়ানোর কথা তুলো না ফ্রেড। কাজকর্ম মাথায় উঠবে তা হলে। সব্বাইকে ওই ব্যালারাটে গিয়ে বেলচা-ছাঁকনি নিয়ে বসে থাকতে হবে।"

আবার হো হো হাসি। রত্নমালা গুম। আর এভাবেই ঠাট্টাতামাশা, গল্পগুজবের মাঝে গাড়ি কখন ফিলিপ আইল্যান্ডে হাজির। পাঁচটা বেজে গিয়েছে। হাতে বেশি সময় নেই, টিকিট কেটে সকলে মিলে ছুটলেন পেঙ্গুইন গ্যালারিতে। হিহি কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়লেন সিমেন্টের আসনে।

পেঙ্গুইনদের দর্শন পাওয়া গেল পাঁচটা পঁয়ত্রিশে। সূর্য তখন ডুবুডুবু। সমুদ্রের ঢেউয়ে দোল খেতে খেতে আসছে ঝাঁকে ঝাঁকে। প্রথমে দলের এক কর্তা পারে উঠে ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নিরীক্ষণ করল চারদিক। ফের জলে লাফিয়ে কী সিগনাল দিল কে জানে, বাকিরা বেরিয়ে এল টুপ টুপ। আবার একটা দল এল। আবার একটা দল। লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল কিছুক্ষণ, তারপর খুদে উকিলবাবুরা দুলে দুলে চললেন যে-যার ঘর পানে। অবশ্য শান্তিতে আর যেতে পারে কই! দুষ্টু সিগালের পাল উড়ছে মাথার উপর, নানানভাবে বিরক্ত করছে বেচারাদের। উদ্দেশ্য একটাই, যদি কেউ ঘাবড়ে গিয়ে পেট বোঝাই মাছ থেকে কিছু উগরে দেয়।

দেখতে দেখতে আধো অন্ধকার সমুদ্রপার পেঙ্গুইনবাবুদের

ক্যাচোর-ম্যাচোরে সরগরম। নিজের গর্তে ঢুকে যাওয়ার আগে পর্যন্ত চেঁচামেচি কারও থামেই না। দু'-চারটে বোকাসোকা পেঙ্গুইন আস্তানা খুঁজে না পেয়ে দিশেহারার মতো ঘুরছে এদিক সেদিক। কেউ বা বেমালুম ঢুকে পড়ছে অন্যের ডেরায়, পরমুহূর্তে বেরিয়ে আসছে তাড়া খেয়ে। সব মিলিয়ে ছবিটা যে কী মজাদার?

পেঙ্গুইন দর্শন সেরে এবার ফেরার পালা। তার আগে লাগোয়া রেস্তরাঁয় একপ্রস্থ কফি পান। কাপে চুমুক দিয়ে স্ট্রাউস বললেন, "আর-একটু আগে বেরোলে আমরা আর-একটা স্পটে যেতে পারতাম। তা হলে সিলমাছটাও দেখা হয়ে যেত।"

"পেঙ্গুইনই যথেষ্ট দুর্লভ অভিজ্ঞতা স্যার।" ঋতমের চোখে এখনও ঘোর লেগে আছে। বলল, "এত সামনাসামনি প্রাণীটাকে দেখতে পাব ভাবতেই পারিনি।"

রত্নমালা বললেন, "আমার কিন্তু পেঙ্গুইনদের খুব একটা আহামরি লাগল না। বড্ড জোরে চেঁচায়।"

"ওদের ডানাতেও খুব জোর ম্যাডাম। উড়তে পারে না বটে, তবে ওরাই সবচেয়ে দ্রুতগামী সাঁতারু। জলের মধ্যে ওরা পঁয়ষট্টি-সত্তর কিলোমিটার বেগে ছুটতে পারে। সমুদ্রে দুশো-তিনশো কিলোমিটার পথ অনায়াসে পাড়ি দেয় রোজ।"

আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন স্ট্রাউস, থেমে গেলেন সহসা। এক মধ্যবয়সি সাহেব এসে দাঁড়িয়েছেন সামনে। চমৎকার স্বাস্থ্য, নীল চোখ, সোনালি চুল, পরনে জিনস আর ফুলস্লিভ সোয়েটার।

স্ট্রাউস উচ্ছ্বসিত মুখে হাত বাড়িয়ে দিলেন, "হ্যালো ব্যারি! তুমি এখানে? তোমার তো আকাশ আর রেডিয়ো সিগনাল নিয়ে কারবার। পেঙ্গুইনে কবে এত ইন্টারেস্ট হল?"

"জাস্ট একটু রিলাক্স করতে এসেছি। কালই একটা প্রজেক্টে বেরিয়ে যাচ্ছি কিনা।"

"কোথায় যাচ্ছ? কী প্রজেক্ট?"

"ফার্স্টে যাব কুমা। সেখান থেকে স্নোয়ি মাউন্টেন।"

"কেন? ওখানে কোনও অবজারভেটরি খোলা হচ্ছে নাকি?"

"না, না। অন্য একটা কাজ আছে। দেখেছ নিশ্চয়ই, লাস্ট মানথে ওরবস্টের কাছে একটা স্মল বুশফায়ার হয়েছিল? তারপর থেকে গোটা স্নোয়ি মাউন্টেন রিজিয়নে রেডিয়ো সিগনালের কিছু প্রবলেম হচ্ছে। মাঝে কয়েক দিন সেলফোন কানেকশনও জ্যাম হয়ে গিয়েছিল। ওইসব কারণেই...।"

"দাঁড়াও, দাঁড়াও। তুমি কি এইটিন্থ এপ্রিলের বুশফায়ারের কথা বলছ?"

"ইয়েস। দ্যাট অড ইনসিডেন্ট। শীতের মুখে ভিক্টোরিয়ার জঙ্গলে আগুন কেউ কখনও শুনেছে? আমি গোটা ব্যাপারটা ইনভেস্টিগেট করতে চাই।"

"আরে, আমরাও তো...।" স্ট্রাউস প্রায় লাফিয়ে উঠলেন, "ওই কেসটা স্টাডি করতে তো প্রোফেসর জটাধর জোয়ারদারও এসেছেন ওঁর মিসেস আর ছাত্রকে সঙ্গে নিয়ে। আমরাও তো কালই স্টার্ট করছি।"

ওয়ারাগুল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ব্যারি ওডেনের সঙ্গে দু'মিনিটেই আলাপ হয়ে গেল জটাধরস্যারদের। ব্যারি দারুণ মিশুকে মানুষ, বসে পড়লেন ঋতমদের টেবিলে, শুরু হয়ে গেল আগামীকালের অভিযানের পরিকল্পনা। ব্যারির একখানা বড়সড় ভ্যান আছে, তাঁর ইচ্ছে দুটো গাড়ি না নিয়ে একসঙ্গেই চলুক সবাই।

স্ট্রাউস বললেন, "এ তো খুব ভাল প্রস্তাব। কী বলো জে জে?"

জটাধরস্যার বললেন, "নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই!"

স্ট্রাউস বললেন, "আমার টেন্ট দু'খানাও তা হলে তুলে নেব ব্যারির গাড়িতে।"

"হোয়াই টেন্ট? আমরা তো মোটেলেই থাকতে পারি।"

"হেক্টরও সঙ্গে যাবে যে। অনেক মোটেল তো পেট অ্যালাও করে না।"

ঋতমের ঘাড় আপনাআপনি রত্নমালার দিকে ঘুরে গেল। হ্যাঁ, যা ভেবেছে তাই। মুখ সাদা হয়ে গিয়েছে রত্নমালার।

সকালে আটটা বাজতে না-বাজতেই ব্যারি ওডেনের গাড়ি হাজির। রত্নমালা সবে তখন চার নম্বর স্যান্ডুইচখানা মুখে পুরেছেন। পেস্ট্রি, কলা, দুধ সব তখনও বাকি।

ঋতমের প্রাতরাশের পালা শেষ। চটপট জিনিসপত্র নামানোয় ব্যস্ত হয়ে পড়লেন তিনজনে। ব্যারির ভ্যানখানা শুধু প্রকাণ্ডই নয়, অন্দরের বন্দোবস্তও ভারী চমৎকার। লম্বা টানা সিটগুলোকে শুইয়ে দিলে দিব্যি বিছানা হয়ে যায়। ভিতরে ফাঁকা জায়গাও কম নেই। ব্যারির স্ত্রী লুইজি দেদার খাবারদাবার বানিয়ে দিয়েছেন। তার সঙ্গে ঢুকে গেল জটাধরস্যারদের ব্যাগ, সুটকেস আর টুকিটাকি বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি। তাঁবু দু'খানা তুলে দেওয়া হল ছাদে। হেক্টর বেড়াতে যাওয়ার গন্ধ পেয়েছে, আহ্লাদিত মুখে দখল করে নিল পিছনের সিটখানা। গ্যাঁট হয়ে বসে জুলজুল করে তাকাচ্ছে এদিক-ওদিক।

একে একে উঠে পড়লেন সবাই। ল্যাপটপ কোলে স্ট্রাউস বসেছেন সামনের সিটে, ব্যারির পাশে। মাঝের সারিতে জটাধরস্যার, ঋতম। রত্নমালা এলেন প্রায় মিনিট কুড়ি পর। সাদা চুড়িদার-কামিজের উপর একখানা সাদা ওভারকোট চাপিয়েছেন, মাথায় একটি ক্রিকেটমাঠের টুপি।

আম্পায়ারদের মতো বেশবাস দেখে হেক্টরের প্রাণে বুঝি স্ফূর্তি জেগেছে। সরবে রত্নমালাকে অভ্যর্থনা জানাল, "ব্রাঁউ!"

ব্যস, ওমনি রত্নমালা চুপসে গেলেন। সন্তর্পণে বসলেন ঋতমের পাশটিতে, কাঠ হয়ে।

জটাধরস্যার সামান্য গম্ভীর মুখে বললেন, "অনেক সময় নষ্ট হয়েছে, এবার আমরা রওনা হব। সিট-বেল্টখানা বেঁধে নাও।"

আড়ষ্টভাবে চোখের ইশারায় হেক্টরকে দেখালেন রত্নমালা, "ও বাঁধবে না?"

জটাধরস্যার হেসে ফেললেন। রগুড়ে গলায় বললেন, "তুমি আর হেক্টর কি সমান? জানো না, তোমার প্রাণ কত বেশি মূল্যবান?"

ভাষাটি না বুঝলেও জটাধরস্যারের বাচনভঙ্গিতে কিছু একটা আন্দাজ করেছেন অন্য দুই বিজ্ঞানী। হো হো করে হেসে উঠলেন। হাসতে হাসতে গাড়ি স্টার্ট করলেন ব্যারি। মেলবোর্নের আকাশে আজ অল্প অল্প মেঘ। রোদ আছে, তবে তাপ নেই। কিছুক্ষণের মধ্যেই গাড়ি এসে পড়ল চওড়া রাজপথে। প্রিন্সেস হাইওয়ে। এই সেই রাস্তা, যা কিনা বেড় দিয়ে রেখেছে গোটা অস্ট্রেলিয়াকে।

দূরে ড্যানডেনং পাহাড় দেখা যাচ্ছে। ওখান থেকেই শুরু হল গ্রেট ডিভাইডিং রেঞ্জ। অস্ট্রেলিয়ার কোনও পাহাড়ই তেমন উঁচু নয়, তবে নিসর্গ হিসেবে দেখতে মন্দ লাগে না। জটাধরস্যার ম্যাপ খুলে জায়গাটা বুঝে নিচ্ছিলেন। স্ট্রাউসকে জিজ্ঞেস করলেন, "আমরা এখন সোজা ওরবস্ট যাচ্ছি তো?"

"হ্যাঁ। ভায়া বেয়ার্নসডেল।"

"এগজ্যাক্ট স্পটটা ওরবস্ট থেকে কদ্দূর?"

"মোটামুটি তিরিশ-পঁয়ত্রিশ কিলোমিটার উত্তরে ধরতে পারো।"

"তার মানে আমাদের আজ চারশো পঞ্চাশ কিলোমিটার মতো যেতে হবে! অর্থাৎ টানা গেলে ম্যাক্সিমাম ঘণ্টাপাঁচেক!"

"সে কী? পথে কোথাও থামব না?" ঘাড়ের কাছে হেক্টরের

রোমহর্ষক লম্বা লম্বা নিশ্বাস ভুলে রত্নমালা প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন, "দুপুরে আজ খাওয়া নেই?"

"দুশ্চিন্তা করবেন না ম্যাডাম, গাড়িতে বিস্তর খানা মজুত।" ব্যারি বলে উঠলেন, "ক্রোঁসো, চিজ, মাখন, হ্যাম, সালামি, ডিমসেদ্ধ, হটবক্স ভরতি মাংসের পিঠে...। সঙ্গে কমলালেবু, আমাদের ইয়ারা নদীর উপত্যকার পৃথিবীবিখ্যাত আঙুর...। গলা ভেজানোর জন্য চা-কফিও পাবেন ফ্লাস্কে।"

লম্বা তালিকা শুনে রত্নমালা যেন খানিক আশ্বস্ত। তবু খুঁতখুঁতে গলায় বললেন, "কোথাও ভালভাবে বসে না খেলে আমার যে ঠিক সুখ হয় না ভাই!"

"সেটুকু রেস্ট মিলে যাবে। টানা পাঁচ ঘণ্টা কি গাড়ি চালানো সম্ভব?"

"এটা তুমি কী বললে ব্যারি?" স্ট্রাউস ওমনি প্রতিবাদ করলেন, "সেন্ট্রাল অস্ট্রেলিয়া... মানে যেখানে শুধু মরুভূমি... সেখানে আট-দশ ঘণ্টার আগে তো থামার কোনও জায়গাই পাবে না।"

"তা ঠিক। তবে ভিক্টোরিয়ার ব্যাপারটা তো অন্যরকম। এখানে খুশিমতো বিশ্রামের জায়গা আছে। এত সুন্দর এই রাজ্যটা... পাহাড়, সমুদ্র, নদী, জঙ্গল...।" বলেই ব্যারি রত্নমালাকে প্রশ্ন ছুড়লেন, "আপনি শেরব্রুক ফরেস্টে গিয়েছেন?"

"কই আর! সবে তো পরশু এলাম।... জঙ্গলটা কোথায়?"

"মেলবোর্নের গায়েই। ড্যানডেনং পাহাড়ে। কী সুন্দর সুন্দর পাখি যে আছে ওখানে! রোজেলাগুলোর গায়ে যে কতরকম রঙের বাহার! লাল, নীল, সবুজ, হলুদ, কোনটা যে নেই! এ ছাড়া রঙিন পায়রা, গাছে গাছে কাকাতুয়ার ঝাঁক...। কোকাবুরাও পাবেন। কোকাবুরার ডাকটা ভারী অদ্ভুত, মনে হয় যেন বিটকেলভাবে হাসছে। ওই পাখিটি কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার বাইরে আর কোথাও মিলবে না।"

"তা ওইসব ভাল ভাল জায়গায় না গিয়ে দাবানল দেখাতে নিয়ে যাচ্ছেন?"

"দাবানল নয়। দাবানল যেখানে ঘটেছিল, সেইখানে। সত্যি সত্যি দাবানলের সময় কি কাছাকাছি যাওয়া যায়? আশপাশের বাড়ি-ঘর, গাছপালা সব পুড়ে ছাই হয়ে যায় তখন। ঘোড়া, গোরু, ভেড়া হাজারে হাজারে ঝলসে মরে। মানুষও। এমন তাপ হয় তখন, মনে হয়, দেশটা ছেড়ে পালাই।"

স্ট্রাউস বললেন, "অস্ট্রেলিয়ার দু'খানা দাবানল তো কুখ্যাত হয়ে আছে। উনিশো উনচল্লিশের 'ব্ল্যাক ফ্রাইডে'। শুক্রবার লেগেছিল বলে ওই নাম। আর উনিশশো তিরাশির 'অ্যাশ ওয়েডনেসডে'। ধূসর বুধবার। দু'বারই সত্তর-পঁচাত্তরজন লোক মারা গিয়েছে। এ ছাড়া সিডনির কাছে একবার ক্রিসমাসের দিন দাবানল শুরু হয়েছিল। টানা একুশ দিন সে আগুন নেভানো যায়নি।"

বাইরের ছুটন্ত পৃথিবীটাকে একদৃষ্টে দেখছিল ঋতম। জোরে, অথচ একই গতিতে চলছে গাড়ি। মাঝে মধ্যেই পাশ দিয়ে চলে যায় অতিকায় ট্রাক। এক-একটা প্রায় মিনি মালগাড়ির মতো লম্বা। যতদূর চোখ যায়, দু'ধারে অনন্ত জমি। তার মধ্যেই হঠাৎ হঠাৎ দূরে কোনও একলা কটেজ। লোকজন সত্যিই বড় কম, দেখাই যায় না প্রায়। ছোট ছোট শহর আসছে, সরেও যাচ্ছে।

দেখতে দেখতে ঋতম স্যার-ম্যাডামদের কথাই শুনছিল। হঠাৎ ঘুরে স্ট্রাউসকে জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা স্যার, অনেক ক্যাঙারুও নিশ্চয়ই বুশফায়ারে মারা যায়?"

"অবশ্যই। যা বোকা আর নিরীহ প্রাণী! আত্মরক্ষার বোধটুকু পর্যন্ত নেই! হাইওয়েতে গাড়ি চাপা পড়েও মরে কত।"

"ক্যাঙারুরা সংখ্যায়ও অনেক বেড়েছে।" ব্যারির হালকা মন্তব্য, "এখন তো আবার ক্যাঙারুর মাংস খাওয়াও চালু হয়ে গিয়েছে।"

"ও মা, ক্যাঙারু খাওয়া যায় বুঝি?" রত্নমালার চোখ বড় বড়, "কেমন স্বাদ?"

ঘুরেফিরে আহারের প্রসঙ্গে যাওয়া জটাধরস্যারের মোটেই পছন্দ নয়। গোমড়া মুখে বললেন, "নিজে চেখে দেখো। অক্টোপাস, স্কুইড, কালামারি, সবই টেস্ট করতে পারো। কিন্তু এখন আমাদের একটু কাজের কথা বলতে দাও।"

"আমি কি বাগড়া দিয়েছি?" রত্নমালার মুখ পলকে হাঁড়ি, "ঠিক আছে, এই আমি ঠোঁটে কুলুপ আঁটলাম।"

তিন বিজ্ঞানী মেতে উঠলেন আলোচনায়। ঋতমও প্রশ্ন করছে মাঝে মাঝে। বেয়ার্নসডেল পেরিয়ে বিরতি নেওয়া হল লেক এন্ট্রান্সে। তাসমান সমুদ্র এখানে স্থলদেশে ঢুকে তৈরি করেছে অজস্র হ্রদ। জায়গাটি ভারী মনোরম। হ্রদের নয়নাভিরাম নীল জল আর উথালপাথাল সামুদ্রিক হাওয়ায় দেহমন যেন চনমন করে ওঠে। এখানেই একটা সরবর-শোভিত পার্কে বসে সারা হল মধ্যাহ্নভোজ। ফের রওনা দিল গাড়ি। ছোট শহর ওরবস্টে পৌঁছে প্রিন্সেস হাইওয়ে ছেড়ে বাঁ দিকের একটা অপেক্ষাকৃত সরু রাস্তায় ঢুকে পড়ল। বোনাং রোড। পথ ভুল করা কোনও অবকাশ নেই, গাড়িতে লাগানো জি-পি-এস যন্ত্র অবিরাম নির্দেশ দিয়ে চলেছে চালককে।

এবার জঙ্গল। শুধুই জঙ্গল। দু'ধারে অন্তহীন ইউক্যালিপটাসের সারি। এ গাছ থেকে আঠা আর তেল পাওয়া যায় বলে অস্ট্রেলিয়ানদের ভাষায় 'গাম ট্রি'। নুরান নামের এক প্রায় শুনশান জনপদ অতিক্রম করলেন ব্যারি। খানিক পরেই ডান দিকে নোটিশবোর্ড, 'ফোর কিলোমিটার ট্রেক'।

লেখাটা দেখেই স্ট্রাউস চেঁচিয়ে উঠলেন, 'ব্যস, ব্যস, আমরা এসে গিয়েছি।"

এ দেশে যত্রতত্র গাড়ি দাঁড় করায় না কেউ। তার জন্য খানিক

দূরে দূরে রাস্তার ধারেই আলাদা ব্যবস্থা আছে। আরও দু'-চারশো মিটার এগিয়ে সেরকম একটা স্থান মিলল। গাড়ি থেকে নেমে স্ট্রাউস বললেন, "এবার কিন্তু আমাদের জঙ্গলের ভিতরে যেতে হবে।"

জটাধরস্যার জিজ্ঞেস করলেন, "কতটা ভিতরে?"

"অন্তত এক কিলোমিটার।" হেক্টরের গলায় চেন লাগাচ্ছিলেন স্ট্রাউস। রত্নমালাকে বললেন, "ম্যাডাম, আপনি কি এখানে ওয়েট করবেন?"

"অসম্ভব।" গাড়ি থেকে লাফ দিয়ে নামলেন রত্নমালা। অসন্তুষ্ট চোখে হেক্টরকে দেখে নিয়ে বললেন, "আমি আপনাদের সঙ্গেই যাব।"

পাঁচজন মানুষ এবং একটি কুকুর হাঁটছে জঙ্গলের পথ ধরে। পায়ের নীচে শুকনো পাতার খড়মড়। রত্নমালা ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছিলেন চারদিক। হঠাৎই বললেন, "এমন নির্জন জঙ্গলে ঢোকাটা কি ঠিক হল? যদি বাঘ-ভল্লুক হানা দেয়?"

"অস্ট্রেলিয়ায় বাঘ কোথায়!" স্ট্রাউস অভয় দিলেন, "তাসমানিয়ায় অল্প কিছু ছিল, তারা তো সত্তর-পঁচাত্তর বছর আগে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। আর তল্লুক তাসমানিয়ার বাইরে কোথাও নেই। যদি ডিংগোর পাল বেরিয়ে আসে, তা হলে অবশ্য চিন্তার কথা।"

"ডিংগো কী?"

"এক ধরনের কুকুর। নেকড়ের মতো। বহু বহু যুগ আগে এখানকার আদিবাসীদের পূর্বপুরুষরা এশিয়া থেকে এনেছিলেন। ডিংগোগুলোই মাঝে মাঝে উৎপাত করে, তবে সাধারণত রাত্রি ছাড়া বেরোয় না।"

কথা শেষ হওয়ার আগেই হঠাৎ হেক্টরের বিকট চিৎকার। পাঁচজোড়া পা একসঙ্গে থেমে গেল। দূরে একটা শব্দ হচ্ছে না?

আস্তে আস্তে কাছে আসছিল আওয়াজটা। হেক্টরের ডাকও উচ্চকিত ক্রমশ। খানিক পর অবশ্য মালুম হল ভয়ের কোনও কারণ নেই। জন্তুজানোয়ার নয়, একজন মানুষ বেরিয়ে এল জঙ্গল থেকে। চেহারা দেখেই ঠাহর হল, লোকটা আদিবাসী। শক্তপোক্ত গড়ন, কোঁকড়া চুল, পুরু ঠোঁট, গায়ের রং পোড়া বাদামি। বয়স তিরিশ-বত্রিশ হবে, কি আরও কম। পরনে থ্রি-কোয়ার্টার প্যান্ট, রংচঙে ফুল ফুল ছাপ শার্টের উপর জ্যাকেট, মাথায় কাউবয় টুপি।

লোকটাই আগে চেঁচিয়ে উঠল, "হেই, তোমরা এখানে কী মতলবে?"

ব্যারি জবাব দিলেন, "আমরা দরকারি কাজে এসেছি। তুমি কে?"

"আমি বাম্পানা। একজন ওয়াদি-ওয়াদি। এখন ক'দিন এই জঙ্গলেই আছি।"

অস্ট্রেলিয়ায় সাহেবদের উচ্চারণ এমনিই একটু আলাদা রকম। তুলনায় বাম্পানার ইংরেজি যেন আরও বেশি জড়ানো-পাকানো। বুঝতে অসুবিধে হয় রীতিমতো। তবু মোটামুটি আন্দাজ করতে পারল ঋতম। গলা নামিয়ে জটাধরস্যারকে বলল, "ওয়াদি-ওয়াদি নিশ্চয়ই কোনও ট্রাইবের নাম?"

"হুঁ, এরকম নানান ধরনের উপজাতি আছে এখানে। এরাই তো সব অস্ট্রেলিয়ার আদি বাসিন্দা!"

বাম্পানা কাছে এসেছে। কোমরে হাত রেখে, ঘাড় বেঁকিয়ে নিরীক্ষণ করছে সবাইকে। ব্যারি ফের প্রশ্ন করলেন, "তা তুমি জঙ্গলে করছটা কী?"

"ছুটি কাটাচ্ছি। সারাদিন ডিজিরিডু বাজাই, পাখির গান শুনি, আর পিছনের নদী থেকে মাছ ধরে খাই।"

"মহানন্দে আছ তো! বাড়ি কোথায়?"

"বোম্বালা। শহরে থাকতে আমার ভাল লাগে না। নুরানে কাকার কাছে এসেছিলাম, তারপর এই জঙ্গলেই রয়ে গিয়েছি। শীত পড়া পর্যন্ত থাকব।"

বলেই এক অদ্ভুত কাণ্ড করল বাম্পানা। হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল হেক্টরের সামনে। সটান গলা জড়িয়ে ধরল হেক্টরের। গালে গাল ঘষছে। কী আশ্চর্য, হেক্টরও যেন মহা আহ্লাদিত। ডাকাডাকি ভুলে কুঁইকুঁই আওয়াজ বের করছে গলা থেকে, আর সুখে লেজ নাড়াচ্ছে।

রত্নমালার চোখ কপালে। হতবাক স্বরে বললেন, "দানবটাকে বশ করে ফেলল? ছেলেটা ম্যাজিক জানে নাকি?"

"জানেই তো!" স্ট্রাউস হাসলেন, "ম্যাজিকটার নাম ভালবাসা। জন্তুজানোয়ারা এই ভালবাসাটা ভীষণ টের পায়।"

"হুঁ, যত্ত সব।" রত্নমালা মুখ বাঁকালেন, "আপনারা এখানেই আটকে গেলেন যে? আর এগোবেন না?"

"দাঁড়াও দাঁড়াও। ছেলেটার সঙ্গে আর একটু আলাপ করি।" জটাধরস্যার গলা ঝেড়ে বাম্পানাকে বললেন, "তুমি তা হলে এই জঙ্গলে একাই আছ?"

"একা থাকাই আমার পছন্দ।" বাম্পানা দাঁত বের করে হাসল, "তোফা একখানা তাঁবু খাটিয়ে নিয়েছি। আমার আর কীসের চিন্তা? বিশ-পঞ্চাশটা জিংগো বোধহয় আছে জঙ্গলে। গলার আওয়াজ পেয়েছি, তবে তারা আমায় ঘাঁটায় না। বাম্পানা ওদের ক্ষতি করে না, ওরা কেন বাম্পানার সঙ্গে শত্রুতা করবে বলো?"

"তা বটে। তা কবে ঢুকেছ জঙ্গলে?"

"একমাস তো হবেই। পরশু ছিল কালো রাত... ঠিক তার আগের কালো রাতে...।"

"অর্থাৎ আগের অমাবস্যায়? তার মানে বুশফায়ারটার সময় তুমি এখানেই...?"

"হ্যাঁ তো! আসার পরদিনই তো! প্রায় আমার চোখের সামনে ঘটল।"

"কীরকম?"

"রাত্তিরে নদীর ধারে গিয়ে বসে আছি। হঠাৎ একটা দমকা বাতাস, তারপর পিছনে দপ করে একটা আলো। চমকে তাকিয়ে দেখি, জঙ্গলে আগুন লেগেছে। কাছে নয়, বেশ খানিকটা দূরে। বলতে লজ্জা নেই, বাম্পানা কিন্তু বেজায় ভয় পেয়েছিল। আগুন যদি ছড়ায় তো সর্বনাশ! জ্যান্ত পুড়ে মরতে হবে নির্ঘাত। তাপেও তো ঝলসে যেতে পারি। আমার কপালটা অবশ্য খুব ভাল। নদীতে ঝাঁপ দেব, নাকি জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে পালানোর কোনও রাস্তা ধরব, এটা ঠিক করতে করতেই ভুস করে আগুনটা নিভে গেল।"

"ভুস করে মানে?"

"যেমন হঠাৎ জ্বলেছিল, তেমন হঠাৎই শেষ। উপরওয়ালার দয়া না থাকলে এমন হয়, বলো? ভাগ্যিস আমার ঠাকুরমা নামটা বাম্পানা রেখেছিলেন, নইলে ঈশ্বরের করুণা জাগত কি?"

বাম্পানার হাত-মুখ নেড়ে কথা বলার ভঙ্গিটি ভারী মজাদার লাগছিল ঋতমের। চোখ পিটপিট করে জিজ্ঞেস করল, "কেন গো? বাম্পানা নামটার কী মাহাত্ম্য আছে?"

"বা রে! বাম্পানা যে আগুনেরই দেবতা। বাম্পানা জঙ্গলে ছিল বলেই না আগুন আর ছড়াতে পারল না।"

স্ট্রাউস চোখ কুঁচকে শুনছিলেন কথাগুলো। বললেন, "কতক্ষণ জ্বলেছিল আগুনটা?"

"প্রায় ঘণ্টাখানেক।" এবার যেন বাম্পানাকে একটু অপ্রসন্ন দেখাল। ভুরু নাচিয়ে প্রশ্ন করল, "তোমরা এত কথা জানতে চাইছ কেন বলো তো? তোমরা কি পুলিশ? আমি কিন্তু আগেই যা বলার সব বলে দিয়েছি, নতুন করে আর পুলিশকে জবাবদিহি করব না।"

জটাধরস্যার তাড়াতাড়ি বললেন, "না, না, না, ওসব কিছু নই। আমরা জাস্ট বিজ্ঞানী। দাবানল নিয়ে গবেষণা করি।"

"এটা আবার গবেষণা করার মতো কাজ নাকি?" বাম্পানা হাত ওলটাল, "মানুষ অন্যায় করে বলে ভগবান পৃথিবীতে আগুন লাগিয়ে মানুষকে শাস্তি দেয়। বেচারা জীবজন্তুগুলো পর্যন্ত মানুষের দোষে পুড়ে মরে।"

ঋতম মনে মনে হাসল একটু। অস্ট্রেলিয়া যে পৃথিবীর শুষ্কতম মহাদেশ, বৃষ্টিপাতের পরিমাণ খুব কম বলেই এখানকার জঙ্গলে প্রায় ফি বছর আগুন লাগে, এসব বাম্পানাকে বুঝিয়ে লাভ নেই। বুঝবেই না হয়তো। তবে বাম্পানার সরল কথাগুলোয় খানিকটা সত্যিও তো আছে। যেভাবে নির্বিচারে প্রকৃতিকে ধ্বংস করা চলছে, তাতে তো প্রকৃতির রোষ জাগতেই পারে। দাবানলকে সেই রাগের প্রকাশ ধরে নেওয়া— কী এমন ভুল!

ব্যারি ঘড়ি দেখছেন। ব্যস্তভাবে বললেন, "সাড়ে চারটে বাজে। শীতের মুখে আর বেশিক্ষণ আলো থাকবে না। এবার কিন্তু আমাদের স্পটটা ঘুরে আসা দরকার।"

বাম্পানা উৎসাহিত মুখে বলল, "চলুন, দেখিয়ে আনছি।"

পথপ্রদর্শনের অবশ্য প্রয়োজন ছিল না। অকুস্থল স্ট্রাউসের চেনা, তিনিই চলেছেন আগে আগে। কী মনে হতে হঠাৎ বাম্পানাকে বললেন, "আচ্ছা, আমি তো আর একদিন এসেছিলাম। সেদিন তোমার সঙ্গে দেখা হয়নি কেন?"

"রাস্তার দিকটায় বড় একটা আসি না যে! নদীর পারটাই আমার বেশি প্রিয়। তা ছাড়া এপাশ দিয়ে পুলিশ ঢোকে মাঝে মাঝে। আমাকে দেখলেই তারা আবোল তাবোল জেরা করে। পুলিশের ধারণা, আমি বোধহয় সেদিন গাছগাছালিতে আগুন ধরিয়েছিলাম। কী করে বোঝাই, আমি সেদিন আগুনই জ্বালাইনি।" বাম্পানা

গজগজ করল, "আমার কোনও কথাই ওরা মানতে চায় না। কত বললাম, সেদিন দু'-দু'বার প্রচণ্ডবেগে ঝোড়ো হাওয়া ছেড়েছিল। প্রথমবার, আগুন লাগার ঠিক আগে। দ্বিতীয়বার, আগুন নেভার পর পরই। জঙ্গলে কত দূর পর্যন্ত যে গাছপালা উথাল-পাথাল নেচে উঠেছিল! যেন কেউ ঝুঁটি ধরে তাদের ঝাঁকাচ্ছে।"

"তাই নাকি?" স্ট্রাউস দাঁড়িয়ে পড়লেন, "পুলিশ তো এই বাতাসের কথাটা বলেনি?"

"তারা তো হেসেই উড়িয়ে দিল!" বাম্পানার মুখ বেজার, "আমি নাকি আজগুবি গল্প শোনাচ্ছি।"

স্ট্রাউসের কপালে ভাঁজ। ঘাড় ঘুড়িয়ে জটধারস্যারকে বললেন, "ঘটনাটা তো আরও অস্বাভাবিক হয়ে গেল জে জে ! শরতে হঠাৎ ঝোড়ো হাওয়া, অথচ ওয়েদার রিপোর্টে তার হদিশ নেই?"

জটাধরস্যারকেও খানিক চিন্তিত দেখাল। মাথা নেড়ে বললেন, "বাতাসে তো আগুন হু হু করে ছড়িয়ে পড়ার কথা ফ্রেড। তার বদলে নিভে গেল?"

ব্যারি ভাবিত মুখে বললেন, "কোনও ম্যাগনেটিক স্টর্ম নয় তো? সেই কারণেই হয়তো রেডিও সিগনালগুলো...।"

"কিন্তু চৌম্বক ঝড় হঠাৎ আসবে কোথা থেকে?" স্ট্রাউস ফের চলতে শুরু করলেন। "যাই হোক, ব্যাপারটা নিয়ে ভাবতে হবে।"

হাঁটতে হাঁটতে ঋতম শুনছিল কথাগুলো। পা থেমে গেল আচমকা। এতক্ষণ ভারী সুন্দর জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল তারা। শীতের আগে লালের ছোঁয়া লেগেছে সবুজ পাতায়, বিকেলের সূর্যের আলোয় ঝলমল করছিল গাছপালা। কিন্তু সামনে জঙ্গলের এ কী বিকট চেহারা? বেশ খানিকটা জায়গা জুড়ে গাছগুলো পুড়ে কালো। ডালপালার কোনও অস্তিত্বই নেই, শুধু কাণ্ডগুলো খাড়া হয়ে আছে মাটির উপর।

সকলেরই গতি রুদ্ধ হয়েছে। হাঁ করে দেখছেন চারদিক। গোটাকয়েক গাছকে পর্যবেক্ষণ করে এসে জটাধরস্যার বললেন, "একটা নির্দিষ্ট হাইট পর্যন্ত পুড়েছে, তার নীচে কিন্তু কালো দাগ নেই।"

"এটাই তো আমার আজব লেগেছিল।" স্ট্রাউস গম্ভীর, "আর-একটু এগিয়ে যাও, আবার একটা অভিনব দৃশ্য দেখতে পাবে। বুশফায়ারের সঙ্গে যা কোনওভাবেই মেলে না।"

হ্যাঁ, দেখার মতোই দৃশ্য বটে। জঙ্গলের মধ্যিখানে বেশ খানিকটা জায়গা জুড়ে কী বিশ্রী এক ক্ষতচিহ্ন। চারপাশে আধপোড়া গাছ, আর তার মাঝের মাটিটা বিচ্ছিরি রকমের কালো। আগাছা কিংবা ঝোপঝাড়ের চিহ্নটুকু পর্যন্ত নেই। যেন কেউ জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে খাক করে দিয়েছে জায়গাটা। আরও আশ্চর্যের বিষয়, মাত্র কয়েক হাত তফাতে বেঁটেখাটো গাছগাছালি দিব্যি বহাল তবিয়তে বিদ্যমান। ঝকঝক করছে সজীব পাতা, আগুনের কোনও আঁচই লাগেনি সেখানে।

জটাধরস্যার বিস্মিত মুখে বললেন, "এটা কী করে সম্ভব হল ফ্রেড? জঙ্গলে যদি ঝোড়ো হাওয়া উঠেই থাকে, আগুন শুধু ওইটুকু মাটি পুড়িয়ে ক্ষান্ত হল কেন?"

ব্যারি বললেন, "ভাল করে দেখো, এখানেও আশপাশের গাম-ট্রিগুলোর নীচের অংশ পুরোপুরি অক্ষত। এমনকী, বেশ কিছু ডালপালাকেও আগুন স্পর্শ করেনি।"

"ইয়েস।" স্ট্রাউস বললেন, "অথচ ওই ডালপালাই দাবানলের আসল ইন্ধন। ইউক্যালিপটাস গাছে যে তেল থাকে, তা থেকে অদ্ভুত এক গ্যাস তৈরি হয়। সেই গ্যাস জ্বলে উঠে আগুনের গোলা হয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে ছড়ায়। কিন্তু এখানে সেসব কিছুই ঘটেনি।"

ঋতম ফস করে বলে ফেলল, "আমার তো দেখে মনে হচ্ছে, আগুনটা যেন কেউ সযত্নে নিভিয়ে দিয়েছে।"

"কারেক্ট।" জটাধরস্যার সায় দিলেন। ঘুরে ঘুরে জায়গাটা পরিদর্শন করতে করতে বললেন, "ওয়ান মোর থিং। মাটি পুড়ে যাওয়ার আর-একটা বিশেষত্ব তোমাদের নজরে পড়েছে কি? কালচে হয়ে যাওয়া অঞ্চলটার কিন্তু একটা নির্দিষ্ট শেপ আছে। ভালভাবে দেখো, এটা যেন ঠিক একটা ষড়ভুজ।"

"হুম, সেরকমই লাগছে বটে!" ব্যারি মাথা দোলালেন, "এমন একটা জ্যামিতিক আকৃতিতে আগুন লাগা... উঁহু, বিশ্বাস করা কঠিন।"

বেশিক্ষণ চুপ থাকলে পেট ফোলে রত্নমালার। অনেকক্ষণ ধরেই মন্তব্য করার জন্য উসখুস করছিলেন। দুম করে বলে উঠলেন, "অন্য কোনও গ্রহ থেকে কিছু উড়েটুড়ে আসেনি তো? সেই রাতে এই জঙ্গলে হয়তো কোনও মহাকাশযান নেমেছিল?"

কথাটা ভারী মনে ধরেছে বাম্পানার। চোখ ঘুরিয়ে বলল, "আমারও সেরকমই একটা ধারণা। নির্ঘাত আকাশ থেকে কোনও মনস্টার হানা দিয়েছিল জঙ্গলে। তবে সে উবে গেল কী করে সেটাই শুধু বুঝতে পারছি না।"

"আহা, উবে যাবে কেন, হয়তো ফিরে গিয়েছে।" রত্নমালা হাসি হাসি মুখে বললেন, "মহাকাশযানের ভিতরে যারা ছিল, তাদের হয়তো এই জঙ্গল পছন্দ হয়নি। আর তাই একটা ঝড়টড় বাধিয়ে শাঁ করে উধাও।"

রত্নমালা বা বাম্পানার বিজ্ঞ অভিমতকে জটাধরস্যাররা অবশ্য কেউই তেমন আমল দিলেন না। বিকেল ফুরিয়ে আসছে, স্তিমিত আলোয় জঙ্গলে এখন আর কিছু নিরীক্ষণ সম্ভব নয়। এবার গুটিগুটি ফিরতে শুরু করলেন সকলে। বাম্পানাও চলেছে সঙ্গে। হেক্টরের গায়ে হাত বোলাতে বোলাতে।

রাস্তার কাছাকাছি পৌঁছে জটাধরস্যার জিজ্ঞেস করলেন, "রাতে তা হলে আমরা থাকছি কোথায়?"

ব্যারি বললেন, "আমার তো ইচ্ছে বোম্বালা হয়ে সোজা কুমা। কাল সকাল থেকে তা হলে স্নোয়ি মাউন্টেনে আমার কাজটা আরম্ভ করতে পারি।"

বাম্পানা প্রায় লাফিয়ে উঠে বলল, "তোমরা এখন বোম্বালা যাচ্ছ নাকি?"

"হ্যাঁ। বোম্বালা হয়ে বোনাং রোড ধরে সোজা...।"

"আমাকে তা হলে একটু বোম্বালায় নামিয়ে দেবে, প্লিজ? এর মধ্যেই জঙ্গলে বড্ড ঠান্ডা পড়ে গিয়েছে। রাত্তিরে তো শীতে প্রায় জমে যাওয়ার দশা! তোমাদের গাড়িতে যদি জায়গা হয়...। বাড়ি গিয়ে কয়েকটা গরম জামাকাপড় নিয়ে আসতে পারি।"

স্ট্রাউস বললেন, "বেশ তো, চলো! তবে হেক্টরের সঙ্গে পিছনের সিটে বসতে হবে।"

"নো প্রবলেম। একটু ওয়েট করো, আমার ব্যাগেজটা নিয়ে আসি।"

বলেই পোঁ পোঁ দৌড়। ঋতমরাও পায়ে পায়ে গাড়ির কাছে। হাতে খানিক সময় পেয়ে ব্যারি বের করে ফেললেন কফির ফ্লাস্ক। বিস্কুট সহযোগে বিলি হয়ে গেল গরম গরম কফি। কাপে চুমুক দিয়ে স্ট্রাউস ব্যারিকে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার কী মনে হয়, এখানকার বুশফায়ারটার সঙ্গে স্নোয়ি মাউন্টেনের দিকে রেডিয়ো সিগনাল গড়বড় হওয়ার কোনও সম্পর্ক আছে?"

"আমার তো আগেই একটা সন্দেহ ছিল। স্পট ইনস্পেকশন করার পর ধারণাটা আরও জোরালো হল।"

"কেন?"

"কারণ, দুটো ইনসিডেন্টই যথেষ্ট স্ট্রেঞ্জ।" ব্যারি কাঁধ ঝাঁকালেন, "ঝড় হল, অথচ বুশফায়ার নিভে গেল, একফোঁটা বৃষ্টি না হওয়া সত্ত্বেও। তারপর ধরো, সব ক'টা গাম-ট্রি একই হাইট পর্যন্ত পুড়েছে।

মাটি ছারখার হয়েছে হেক্সাগনাল শেপে। ওদিকে স্যাটেলাইট কানেকশনে কোনও গন্ডগোল নেই, কিন্তু রেডিয়ো সিগনাল হঠাৎ হঠাৎ হারিয়ে যাচ্ছে। এবং এই সব ক'টা ঘটনারই স্টার্টিং পয়েন্ট শেম নাইট, শেম টাইম। এইটিনথ এপ্রিল, রাত সাড়ে এগারোটা।"

"কিন্তু স্নোয়ি মাউন্টেন তো এখান থেকে অনেকটা দূর। প্রায় আড়াইশো কিলোমিটার। অতটা দূরত্বে দাবানলের কী এফেক্ট থাকতে পারে?"

"সেটাই তো বোঝার চেষ্টা করছি। কেমন যেন মনে হচ্ছে একটা কার্যকারণ সম্পর্ক বোধহয় আছে। হয়তো...।"

কথা অর্ধসমাপ্ত রয়ে গেল। হঠাৎই রত্নমালার উল্লাসধ্বনি, "ক্যাঙারু! ক্যাঙারু!"

চারজোড়া চোখ একসঙ্গে ঘুরেছে। সত্যি সত্যিই গোটা ছয়েক খাড়া খাড়া কান ক্যাঙারু একেবারে সামনে হাজির। জঙ্গল থেকে বেরিয়ে ভিতু ভিতু চোখে তাকাচ্ছে ইতিউতি। দু'জনের পেটের থলিতে উঁকি দিচ্ছে বাচ্চা।

হেক্টর তাদের দেখে রীতিমতো উত্তেজিত। ঘ্রাঁউ ঘ্রাঁউ চেঁচাচ্ছে। হেক্টরের হাঁকাহাঁকিতে ক্যাঙারুর দল দু'-চার সেকেন্ড হতচকিত। তারপর লেজে ভর দিয়ে জোড়া পায়ে লাফাতে লাফাতে ফের জঙ্গলে ধাঁ।

রত্নমালা আহ্লাদে আটখানা। ডগমগ স্বরে বললেন, "আমার দু'নয়ন সার্থক হল! অস্ট্রেলিয়ার জঙ্গলে স্বচক্ষে ক্যাঙারু দেখলাম!"

"এখানেই তাঁবু খাটিয়ে ফেলব নাকি ম্যাডাম? বনের ধারে?" স্ট্রাউস ঠাট্টা জুড়লেন, "গোটা রাত্তিরটা কাটালে আরও অনেকের সাক্ষাৎ মিলবে। বাম্পানা তো বললই, ডিংগোর পাল ঘুরে বেড়াচ্ছে। কপালে থাকলে এক-আধটা পসামেরও দর্শন পেতে পারেন।"

"পসাম?" ঋতম জিজ্ঞেস করল, "সেটা আবার কী?"

"এক ধরনের বাদুড় কিংবা কাঠবিড়ালিও বলা যায়। নিশাচর প্রাণী, গাম-ট্রির কোটরে বাসা বেঁধে থাকে, পাতাটাতা খায়। ভিক্টোরিয়ার পসাম সাইজে বেশ ছোট। স্বভাবে ভারী লাজুক। ওদের গায়ের চামড়া ছড়িয়ে প্যারাসুটের মতো হয়ে যায়, তখন ওরা বাতাসে ভেসে ভেসে দিব্যি এক গাছ থেকে অন্য গাছে উড়ে যেতে পারে।"

"না, না, ওসব বিদ্‌ঘুটে জীব দেখার আমার শখ নেই।" রত্নমালা জোরে জোরে মাথা নাড়লেন, "পেঙ্গুইন, ক্যাঙারু হয়ে গিয়েছে, এবার একটা কোয়ালা দেখতে পেলেই যথেষ্ট! জঙ্গল থেকে এখন বেরোতে পারলে বাঁচি। ছোকরাটা যে কখন আসবে!"

বাম্পানা এল আরও আধ-ঘণ্টাটাক পর। জঙ্গলে তখন বেশ অন্ধকার নেমেছে। পিঠে তার ইয়া এক রুকস্যাক, কাঁধে লম্বা চোঙার

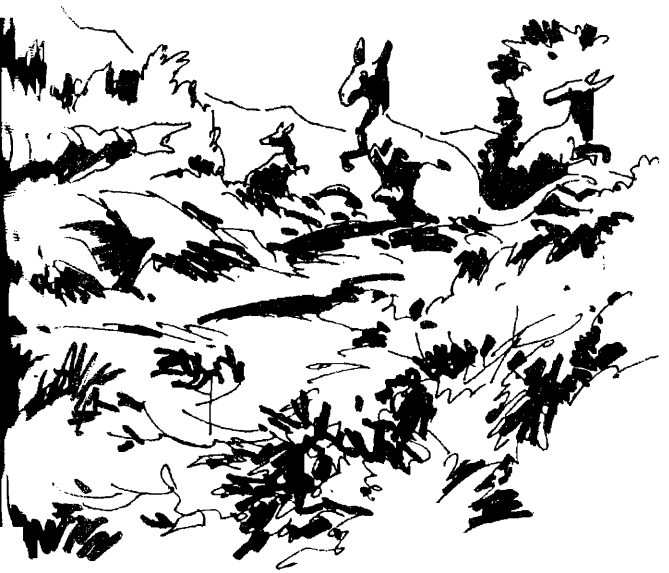

মতো দেখতে আদিবাসী বাদ্যযন্ত্র ডিজিরিডু, হাতে একটা মাঝারি সাইজের বুমেরাং। গাড়ির মাথায় ব্যাগ আর ডিজিরিডু তুলে দিয়ে হেক্টরের পাশে গুছিয়ে বসল।

গাড়িতে যেতে যেতে বুমেরাংখানা উলটে-পালটে দেখছিলেন জটাধরস্যার। রত্নমালাকে জিজ্ঞেস করলেন, "এই নকশাদার বাঁকানো কাঠের পাতখানার বিশেষত্ব কী জানো তো?"

"খুব জানি।"

"রাইট। তবে এই অস্ত্রটি ছোড়া খুব সোজা নয়। কায়দা আছে।"

স্ট্রাউস বললেন, "মোটামুটি পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কোণ করে ছুড়তে হয়। অনেক চেষ্টায় আমি টেকনিকটা রপ্ত করেছি। বনে-জঙ্গলে ঘুরতে হলে একটা রেখেও দিই সঙ্গে।"

বুমেরাং-এর কেরামতি নিয়ে গল্প শুরু হয়ে গেল। কবে

বুমেরাং-এর কল্যাণে তাসমানিয়ার হিংস্র ভল্লুকের হাত থেকে পরিত্রাণ পেয়েছিলেন স্ট্রাউস, কীভাবে বুমেরাং-এর ঘায়ে উড়ন্ত পাখিদের মারে বাম্পানা, চলছে তার বিশদ বর্ণনা।

কথায় কথায় বোম্বালা এসে গেল। ছোট্ট শহরটা অসম্ভব রকমের নির্জন। বাড়িঘর, দোকানপাট, গির্জা, স্কুল সবই আছে, কিন্তু মানুষ চোখে পড়ে না একটাও। আলো ঝলমল পথঘাট দেখে মনে হয়, এ বুঝি এক জাদুনগরী, যার বাসিন্দারা হঠাৎ ভিনদেশে চলে গিয়েছে।

একটা ছোট কটেজ প্যাটার্নের বাড়ির সামনে নেমে পড়ল বাম্পানা। বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার জন্য বারবার ধন্যবাদ জানাল। রত্নমালা একবার অনুরোধ করতেই প্রকাণ্ড ডিজিরিডু নিয়ে বসে গেল নির্জন রাস্তার ধারে। বাজনাটা শুনে ঋতমও মোহিত। গুপী-বাঘাকে তিন বর দেওয়া ভূতের রাজার কণ্ঠস্বরের সঙ্গে বাজনাটার সুরের কী অদ্ভুত মিল! সত্যজিৎ রায় নির্ঘাত ডিজিরিডু শুনেছিলেন।

সুর পরিবেশন সেরে, লটবহর নিয়ে, বাড়ি ঢুকে যাচ্ছিল বাম্পানা, কী ভেবে ঘুরে এল। গাড়ির জানলায় এসে স্ট্রাউসকে বলল, "মিস্টার, তোমরা খুব ভাল লোক। আমি তোমাদের একটা জিনিস উপহার দিতে চাই।"

স্ট্রাউস অবাক মুখে বললেন, "কী জিনিস?"

রুকস্যাক খুলে কাপড়ের ভাঁজ থেকে একটা চৌকো ধাতব পাত বের করল বাম্পানা। স্ট্রাউসকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, "এটা আমি জঙ্গলে কুড়িয়ে পেয়েছিলাম। যেখানে বুশফায়ার হয়েছিল, সেখান থেকে। সেদিন যে আকাশ থেকে সত্যি সত্যি মনস্টাররা এসেছিল, এটা তার প্রমাণ!"

বোম্বালা থেকে কুমা ঘণ্টাদেড়েকের পথ। ফাঁকা রাস্তা বেয়ে হু হু করে ছুটছে গাড়ি। গাঢ় অন্ধকারে বাইরের কিছুই প্রায় দেখা যায় না। তবে এটুকু দিব্যি টের পাওয়া যাচ্ছে জঙ্গল শেষ, দু'ধারে এখন শুধুই

ধু ধু প্রান্তর। হঠাৎ হঠাৎ রাস্তা থেকে অনেক দূরে চোখে পড়ে ক্ষীণ আলোর রেখা। দেখ না-দেখ, হারিয়েও যায় আলোটুকু। গাড়ি চালাতে চালাতেই ব্যারি জানালেন, ওই আলো নাকি পশুখামারের। এদিকের এই স্নোয়ি মাউন্টেন অঞ্চলের পশুখামারে নাকি হাজারে হাজারে ভেড়া পোষা হয়। আর সেই ভেড়ার লোম থেকে তৈরি হয় বিখ্যাত অস্ট্রেলিয়ান উল।

শুনেই রত্নমালা উৎসাহে লাফাচ্ছেন, "ও মা, তাই নাকি? তা হলে তো কুমায় গিয়ে আগে উল কিনব।"

ব্যারি হেসে বললেন, "কুমায় কেন, উল তো আপনি অস্ট্রেলিয়ার সর্বত্রই পেয়ে যাবেন।"

"তা হোক, যেখানে বেড়াতে যাচ্ছি, সেখানকার কিছু একটা স্মৃতিচিহ্ন রাখব না?"

"আমরা বেড়াতে আসিনি রত্নমালা।" অনেকক্ষণ পর প্রোফেসর জটাধরের স্বর শোনা গেল। গাড়ির আলো জ্বালিয়ে একমনে বাম্পানার দেওয়া চৌকো পাতখানা নিরীক্ষণ করছিলেন। ঋতমকে পাতখানা বাড়িয়ে দিয়ে গম্ভীর মুখে বললেন, "তোমার ম্যাডামের বকবকানি না শুনে, জিনিসটাকে ভালভাবে লক্ষ করো।"

ধাতব পাতখানায় তেমন একটা বিশেষত্ব অবশ্য খুঁজে পেল না ঋতম। লম্বায় মেরেকেটে বিশ সেন্টিমিটার, চওড়ায় তার অর্ধেক, দু'মিলিমিটারও পুরু হবে কিনা সন্দেহ। রংটা ঠিক ইস্পাত-নীলও নয়, আবার রুপোলিও নয়। দুটোর মাঝামাঝি। একটাই যা অবাক করা ব্যাপার, জিনিসটা প্রায় কাগজের মতো হালকা।

ঋতম ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল, "এটা কী মেটাল স্যার? এত লাইট?"

"বুঝতে পারছি না। আদৌ মেটাল কি না তাতেও তো ধন্দ লাগছে।"

"দেখি, আমায় দাও তো," স্ট্রাউস পাতখানা চেয়ে নিয়ে আলগা হাত বোলালেন। উলটেপালটে দেখতে দেখতে বললেন, "কোনও অ্যালয় নয় তো? মানে লোহার সঙ্গে অ্যালুমিনিয়াম, কিংবা অ্যালুমিনিয়ামের সঙ্গে দস্তা, অথবা তামা? অথবা চার-পাঁচটা ধাতুর মিশ্রণ?"

"উঁহুঁ, কোনও ধাতুই এত হালকা নয়।"

"তা-ও তো বটে! কিন্তু জে জে, পাতটা কেমন শক্ত দেখেছ? কিছুতেই বাঁকানো যাচ্ছে না। এরকম একটা জিনিস জঙ্গলের মধ্যে এল কী করে?"

"সেটাও তো ভাবছি।"

"ভাবাভাবির কী আছে? এ তো জলবৎ তরলং," রত্নমালা মন্তব্য ছুড়লেন, "অন্য গ্রহ থেকে যারা এসেছিল, তারাই এটা ফেলে গিয়েছে।"

স্ট্রাউস আর ব্যারি হো হো হেসে উঠলেন। জটাধরস্যারও হাসলেন।

রত্নমালা আহতমুখে বললেন, "আমার কথা বিশ্বাস হচ্ছে না? ঠিক আছে, ওটা আমাকে দাও, আমি কাছে রেখে দিই।"

"তুমি নিয়ে কী করবে?"

"কলকাতায় ড্রয়িংরুমে সাজিয়ে রাখব। ওই আধপাগল বাম্পানার স্মৃতি হিসেবে।"

ব্যস, আর কোনও কথা নেই, পাতখানা সটান চালান হয়ে গেল রত্নমালার ব্যাগে। কিছুক্ষণের মধ্যে ঋতমরাও ঢুকে পড়ল কুমায়। ছোট্টখাট্টো শহর, তবে পথঘাট পুরোপুরি নির্জন নয়। দেখেশুনে একটা মোটেলের সামনে গাড়ি থামালেন ব্যারি। আজকের মতো অভিযান শেষ, এবার রাত্রিবাসের পালা।

গাড়ি থেকে নেমেই হি হি কেঁপে উঠল ঋতম। এতক্ষণ কাচের

পোরাটোপে ছিল বলে বোঝা যায়নি বাইরে কী ভয়ংকর ঠান্ডা। সঙ্গে একটা বিশ্রী হাওয়াও চলছে। হাড় কাঁপানো।

ঝটপট গায়ে পুলওভার, জ্যাকেট চাপিয়ে সকলে মিলে ছুটলেন মোটেলের অফিসে। কাউন্টারে এক দৈত্যাকৃতি অস্ট্রেলিয়ান। গভীর মনোযোগে ক্রিকেটম্যাচ দেখছেন টিভিতে। আচমকা বোর্ডার এসে পড়ায় সাহেব যেন তেমন প্রীত নন। বরং খেলা দেখায় ব্যাঘাত ঘটল বলে একটু যেন বিরক্ত। হাই তুলতে তুলতে অস্ট্রেলিয়ান উচ্চারণে প্রশ্ন হানলেন, "ক'টা রুম চাই?"

স্ট্রাউস বললেন, "তিনটে।"

"মিলবে।"

"একটায় কিন্তু আমি আর আমার পোষা ল্যাব্রাডর থাকব।"

"অন্য কোনও মোটেল হলে হয়তো অনুমতি মিলত না। তবে আমার এখানে নো প্রবলেম। আমি কুকুর ভালবাসি।"

বলেই সাহেবের চোখ সরু, "কোত্থেকে আসছ তোমরা?"

"মেলবোর্ন।"

"টুরিস্ট?"

চোখের ইশারায় আসবার কারণটা বলতে নিষেধ করলেন প্রোফেসর জটাধর। সঙ্গে সঙ্গে গলা ঝেড়ে স্ট্রাউস বললেন, "হ্যাঁ, বেড়াতেই এসেছি। কাল জিন্ডাবাইন যাব, সেখান থেকে স্নোয়ি মাউন্টেনের দিকে...!"

"তোমাদের কি মাছ ধরার নেশা আছে?"

স্ট্রাউস থতমত, "কেন?"

"যদি জিন্ডাবাইন লেকে মাছ ধরার ইচ্ছে থাকে তা হলে কিন্তু আমার মোটেলে জায়গা হবে না। এক্ষুনি কেটে পড়ো।"

এবার পাঁচজনই হতভম্ব। এমন আজব শর্ত কেউ কখনও শুনেছে হোটেলওয়ালার মুখে?

ব্যারি এগিয়ে গিয়ে বললেন, "আমাদের মাছধরার সঙ্গে তোমার কী সম্পর্ক?"

"আমি কোনও পুলিশের ঝামেলা চাই না।"

"মানে?"

"গত সপ্তাহে আমার মোটেলের এক টুরিস্ট জিন্ডাবাইন লেকে মাছ ধরতে গিয়ে নিখোঁজ হলেন। নৌকো নিয়ে লেকে নেমেছিলেন, তারপর থেকে তাঁর আর কোনও পাত্তা নেই। নৌকোটাও লোপাট। এবং এই নিয়ে পুলিশ আমায় যথেষ্ট বিরক্ত করেছে অকারণে। তারপর কাল আবার একই ঘটনা। নৌকোসুদ্ধ মানুষ উধাও। সৌভাগ্যক্রমে এবার অবশ্য বোর্ডারটি উঠেছিল 'মাউন্টেন ভিউ' মোটেলে। ওখানকার মালিককেও খুব হ্যাপা পোয়াতে হয়েছে আজ। অতএব আমার সিদ্ধান্ত, মাছধরার নেশা আছে এমন কাউকে আর রুম দেব না।"

স্ট্রাউস, ব্যারি আর জটাধরস্যার মুখ চাওয়াচাওয়ি করলেন। ব্যারি তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, "আমাদের ওসব শখ নেই। তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো।"

আর কোনও সমস্যা হল না। প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রটুকু গাড়ি থেকে নামিয়ে হেক্টরকে রাতের খাবার দিয়ে দিলেন স্ট্রাউস। বেচারা হেক্টরের বেশ খিদে পেয়েছিল, গোগ্রাসে শুকনো শুকনো দানাগুলো গলাধঃকরণ করে সোজা বিছানায় উঠে পড়ল। ঋতমদেরও পেট চুঁইচুঁই। মোটেলে আহারের বন্দোবস্ত নেই। অগত্যা এই কনকনে শীতেও ফের বেরোতেই হল।

কাছেই একটি চিনে রেস্টুরেন্ট। দিব্যি সাজানো গোছানো। পরিবেশটিও আরামপ্রদ। রাতের মেনু ঠিক করার ভার পড়ল রত্নমালার উপর। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ছেন মেনুকার্ড। দুটো লোকের আকস্মিক অন্তর্ধান নিয়ে ব্যারি বেশ চিন্তিত। আলোচনা করছেন স্ট্রাউস আর জটাধরস্যারের সঙ্গে। স্ট্রাউসের মতে এইরকম গায়েব

হয়ে যাওয়ার ঘটনা একটু অস্বাভাবিক হলেও অস্ট্রেলিয়ানদের মধ্যে একেবারে বিরল নয়। বিশেষত, স্নোয়ি মাউন্টেন অঞ্চলে বুশরেঞ্জার বলে এক ধরনের মানুষ আছে, যারা হঠাৎ হঠাৎ এরকম বেপাত্তা হয়ে গিয়ে লোককে চমকে দিয়ে খুব মজা পায়। ব্যারি কিন্তু মানতে চাইলেন না। সব কিছুতেই তিনি এখন সংশয়ের ভূত দেখছেন। জটাধরস্যারের মনেও সন্দেহের খিঁচ। লোক দুটো নয় জাহান্নমেই গেল, কিন্তু তাদের নৌকো দুটো ভ্যানিশ হয় কী করে?

আচমকা আলোচনা ছিঁড়ে খানখান। রত্নমালা চেঁচালেন, "আমার ব্যাগ, আমার ব্যাগ কোথায় গেল?"

জটাধরস্যার বিরক্তস্বরে বললেন, "যাবে কোথায়, নিশ্চয়ই মোটেলের রুমে রেখে এসেছ।"

"সর্বনাশ, আমার মোবাইলটা যে ব্যাগে?"

"তো?"

"টুকাই বেঙ্গালুরু থেকে ফোন করবে বলেছিল। যদি এখন কলটা আসে?"

"আসবে। গিয়ে দেখে নেবে মিসড কল আছে কি না। তারপর নিজেই একটা রিং করবে।"

"কিন্তু ও যদি আমাকে ফোনে না পায়, নার্ভাস হয়ে পড়বে না? রিং হচ্ছে, অথচ আমি তুলছি না।"

"ফালতু ব্যাপার ছাড়ো না। গিয়ে দেখোখ'ন।"

"কী? ছেলে আমাকে ফোন করছে, সেটা ফালতু ব্যাপার? রইল তোমার খাওয়াদাওয়া, আমি এক্ষুনি ঘরে চললাম।"

রত্নমালার অগ্নিমূর্তি দেখে এবার গুটিয়ে গেলেন জটাধরস্যার। কাঁচুমাচু মুখে বললেন, "ঠিক আছে। আমি নিয়ে আসছি।"

জটাধরস্যারের করুণ মুখখানা দেখে ভারী মায়া হল ঋতমের। এই ঠান্ডায় বয়স্ক মানুষটি যাবেন, আসবেন!

ঋতম দাঁড়িয়ে উঠে বলল, "আপনি বসুন স্যার, আমি আনছি।"

জোরে জোরে পা চালিয়ে মোটেলে এল ঋতম। স্যার-ম্যাডামের রুমে ঢুকেই দেখতে পেয়েছে ব্যাগখানা। সামনের চেন খুলতেই প্রথমে ধাতব পাত, তার তলায় মোবাইল।

সেলফোন হাতে নিয়ে ফের চেন টানতে যাচ্ছে, তখনই এক পিলেচমকানো কাণ্ড। ধাতব পাতখানা হঠাৎই জ্বলে উঠল। অদ্ভুত এক আলো বিচ্ছুরিত হতে শুরু করেছে পাত থেকে। গোটা রুম ভরে গেল নীলাভ দ্যুতিতে।

প্রচণ্ড ভয় পেল ঋতম। প্রথম কয়েক সেকেন্ড ভেবেই পেল না, কী করবে। তারপর সংবিৎ ফিরল। হাতের মোবাইলটা থেকে স্যারের নম্বরটা ধরার চেষ্টা করল।

কিন্তু এ কী! ম্যাডামের মোবাইল যে একেবারে মৃত!

কখন যে মোটেলের রুম থেকে বেরোল, কীভাবে যে ফের চিনা রেস্টুরেন্টে পৌঁছোল, ঋতম যেন নিজেও জানে না। প্রায় নেশাগ্রস্তের মতো টলতে টলতে এসে ধপাস করে বসে পড়ল চেয়ারে। কুমা শহরের হাড়হিম করা ঠান্ডাতেও কপালে বিজবিজে ঘাম। গলায় কোনও আওয়াজই ফুটছে না। কোনওক্রমে শুধু বলতে পারল, "জল"।

প্রিয় ছাত্রর আচমকা এই বেহাল দশা দেখে জটাধরস্যার বেশ বিচলিত হয়ে পড়লেন। তাড়াতাড়ি এগিয়ে দিলেন জলের গ্লাস। একগ্লাস নয়, পরপর তিনগ্লাস শেষ করে ঋতম বুঝি একটু থিতু হল। আস্তে আস্তে শোনাল ধাতবপাতের আলো নিঃসরণের কথা। রত্নমালার মোবাইল অচল হয়ে যাওয়ার ঘটনাটাও বলল কোনওমতে।

শুনেই ব্যারি প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়লেন। ঋতমের হাত থেকে প্রায় ছিনিয়ে নিলেন মোবাইলটা। পটাপট বোতাম টিপে অবাক মুখে বললেন, "কই, এ তো ঠিকই আছে। দিব্যি নেটওয়ার্ক আসছে।"

ঋতম বিড়বিড় করে বলল, "কিন্তু ছিল না স্যার। বিশ্বাস করুন, মোবাইল পুরোপুরি ডেড হয়ে গিয়েছিল।"

"তুমি শিয়োর? সুইচ অন করার চেষ্টা করেছিলে?"

"হ্যাঁ স্যার, অনেকবার। কোনও কাজই হয়নি।"

স্ট্রাউস ভুরু কুঁচকে শুনছিলেন। জিজ্ঞেস করলেন, "আলোর নেচারটা কেমন ছিল?"

"গ্যাস ওভেন থেকে যেরকম নীল শিখা বেরোয়, রংটা ঠিক সেরকম।"

"আর তাপ?"

"ছিল না। অন্তত আমি তো টের পাইনি।"

"অর্থাৎ ধাতব পাতটা গরম হয়নি, কিন্তু তার থেকে আলো বেরোচ্ছিল?"

"হ্যাঁ স্যার।"

"আলোটা কি টানা জ্বলছিল? নাকি থেমে থেমে?"

"একটানাই তো জ্বলছিল স্যার। বাড়া-কমাও ছিল না। আগাগোড়া একইভাবে... অন্তত আমি যতক্ষণ রুমে ছিলাম।"

"ও! আলো জ্বলা অবস্থাতেই তুমি বেরিয়ে এসেছ?"

"হ্যাঁ স্যার। আমি আর ঘরে থাকতে সাহস পাইনি।"

জটাধরস্যার উত্তেজিতভাবে বললেন, "আমাদের কিন্তু এক্ষুনি মোটেলে ফেরা উচিত ফ্রেড। একদমই টাইম নষ্ট করা ঠিক হবে না। এখনও গেলে হয়তো...।"

রাতের খাওয়া মাথায় উঠল। কোনওরকমে নাকে-মুখে গুঁজে দুদ্দাড়িয়ে মোটেল। রুমের দরজা খুলে জটাধরস্যার অবশ্য হতাশ। শুধু জটাধরস্যার কেন, স্ট্রাউস আর ব্যারিরও উৎসাহ নিভে গেল। ঘরে কোথায় সেই নীল আলো? ধাতব পাত নেহাতই নিরীহভাবে পড়ে আছে বিছানায়।

ঋতম তো রীতিমতো বেইজ্জত। দু'দিকে মাথা নেড়ে বলল, "আলোটা কিন্তু আমি দেখেছি স্যার, সত্যি বলছি।"

রত্নমালা এতক্ষণ বেশ সিঁটিয়ে ছিলেন। এবার তাঁর গলা বেরোল। ঋতমের পিঠে হাত রেখে বললেন, "সবটাই তোমার মনের ভুল ঋতম। কোনও কারণে হয়তো একা ঘরে ভয় পেয়েছিলে, তাই ওসব কল্পনায়...!"

ঋতম চুপ মেরে গেল। নীরব হয়ে যাওয়া ছাড়া এখন আর তার কী-ই বা করার আছে? বিজ্ঞান সর্বদাই প্রমাণ চায়। আর প্রমাণ হাজির করতে না পারলে কিছুই তো ধোপে টেকে না, নয় কি?

জটাধরস্যার বিছানায় গিয়ে বসলেন। ধাতব পাতখানা হাতে তুলে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখলেন আবার। মাঝে মাঝেই তাঁর চোখ-নাক-মুখ একসঙ্গে কুঁচকে যাচ্ছে। গভীর কোনও ভাবনায় ডুবে গেলে এমনটাই হয় প্রোফেসর জটাধরস্যারের, ঋতম জানে।

হঠাৎই তড়াং করে উঠে দাঁড়ালেন জটাধরস্যার। লম্বা লম্বা পা ফেলে নিজের ব্রিফকেসখানা নিয়ে এলেন। লেজার টর্চটা বের করলেন। নিজেরই বানানো। সুইচ টিপতেই হলুদ আলো গিয়ে পড়ল ধাতব পাতে। বেশ খানিকক্ষণ এক জায়গায় রশ্মিটাকে ধরে রাখলেন জটাধরস্যার। তারপর টর্চ নিভিয়ে হাত বোলালেন পাতে। গলা থেকে আপনা আপনি বিস্ময় ঠিকরে এল, "ও নো! আমি তো এর কূলকিনারা পাচ্ছি না ফ্রেড! আমার এই লেজ়ার বিমে ইস্পাত পর্যন্ত গলে যায়। আর এই জিনিসটা একটু গরম পর্যন্ত হল না? সমস্ত হিটটাই গিলে নিচ্ছে?"

স্ট্রাউসের চোখ বড় বড় হয়ে গেল, "মেটিরিয়ালটা তা হলে কী হতে পারে জে জে? এটা কি কোনও জটিল কঠিন কম্পাউন্ড?"

"উহুঁ। এতটা তাপ শুষে নিতে পারে এমন কোনও কার্বন যৌগ আছে বলে আমার জানা নেই। সত্যি বলতে কী, কোনও

ধাতুসংকরের পক্ষে আমার লেজ়ার বিমের তেজ হজম করা সম্ভব নয়।"

ব্যারি চুপচাপ আলোচনা শুনছিলেন। হঠাৎই বললেন, "আমার মনে হচ্ছে তোমরা কোথাও একটা ভুল করছ স্ট্রাউস?"

"কীরকম?"

"আগেই কেন ধরে নিচ্ছ, ওই পাতটা এমন মেটিরিয়াল দিয়ে গড়া যা তোমাদের চেনা। এমন তো হতেই পারে মেটিরিয়ালটা সম্পর্কে আমাদের কারও কোনও ধারণাই নেই?"

"তা কী করে সম্ভব?"

"অবশ্যই সম্ভব।" ব্যারি একবার রত্নমালাকে দেখে নিয়ে বললেন, "আমরা ম্যাডামের কথাটা তখন হেসে উড়িয়ে দিয়েছি, বাম্পানাকেও আমল দিইনি। কিন্তু ওঁদের ধারণাটা যদি সত্যি হয়...?"

"তার মানে তুমিও বলতে চাইছ মহাকাশ থেকে কোনও ইউ এফ ও এসেছিল?"

"উঁহুঁ, নিশ্চিতভাবে বলছি না। তবে ধারণাটাকে খতিয়ে দেখতে তো দোষ নেই। ব্যারি একটু থামলেন। কপালে ছোট ভাঁজ ফেলে বললেন, "আমি কি একবার বস্তুটিকে পরীক্ষা করে দেখতে পারি?"

"হোয়াই নট?" জটাধরস্যার দু'হাত ছড়িয়ে দিলেন, "স্বচ্ছন্দে!"

"দাঁড়ান, আমি তবে যন্ত্রটা নিয়ে আসি।"

জটাধরস্যারের পাশের ঘরটাই ব্যারি আর ঋতমের।

মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই ফিরলেন ব্যারি, সঙ্গে একটা চৌকো বাক্স। খুলতেই বেরিয়ে এল এক বিচিত্রদর্শন যন্ত্র। অনেকটা চোঙার মতো চেহারা। কিন্তু কাচের তৈরি। ধাতবপাতের উপর যন্ত্রটা রাখতে রাখতে ব্যারি বললেন, "এটি আমার ব্যক্তিগত মাইক্রোস্কোপ। সাধারণ যে-কোনও মাইক্রোস্কোপের চেয়ে অন্তত একহাজার গুণ বড় করে দেখা যায় সব কিছু।"

স্ট্রাউস বললেন, "কিন্তু অণু-পরমাণু তো দেখতে পাবে না?"

"দেখাই যাক না, কদ্দুর কী মেলে!"

যন্ত্রের সরু দিকটায় এবার চোখ রাখলেন ব্যারি। গলার কাছে সরু সরু চাকা রয়েছে, ঘোরাচ্ছেন মাঝে মাঝে। এক মিনিট, দু'মিনিট, পাঁচ মিনিট...। প্রায় পনেরো মিনিট পর দৃষ্টি সরালেন ব্যারি। চোখের পাতা রগড়াতে রগড়াতে বললেন, "প্রোফেসর জোয়ারদার, আপনি একবার দেখুন তো যা দেখলাম তা সত্যি কিনা!"

"কী দেখলেন আপনি?"

"জিনিসটার গায়ে কিন্তু লক্ষ লক্ষ ছিদ্র। কোটি কোটিও হতে পারে।"

"বলেন কী, এমনি দেখে তো কিছুই বোঝা যাচ্ছে না?"

"হ্যাঁ, ছিদ্রগুলোর ডাইমেনশন ন্যানো অর্ডারে। অর্থাৎ এক সেন্টিমিটারের কোটি ভাগের চেয়েও কম। এই ধরনের ছিদ্র তো পৃথিবীতে কোথাও করা যায় বলে এখনও শুনিনি।" ব্যারি চোখ পিটপিট করলেন, "এমন নয় তো, এইসব ছিদ্র থেকেই আলো বেরিয়েছিল?"

"তা হলে তো পাতের ভিতরে আলোর একটা উৎসও থাকতে হয়?"

"হয়তো আছে। কিংবা এটা এমন একটা যন্ত্র, যা বিশেষ একটি তরঙ্গের আলো ছড়িয়ে দিতে পারে।"

"হুম, ব্যাপারটা বেশ চিন্তায় ফেলল দেখছি!" জটাধরস্যার মাথা নাড়লেন, "ওই আলোর বিকিরণই যদি রত্নমালার মোবাইলকে সাময়িকভাবে অকেজো করে দিয়ে থাকে, তা হলে তো বলতেই হবে, ওই আলো মোটেও সাধারণ আলো নয়।"

"ঠিক, একদম ঠিক। এই আলোর কারণেই হয়তো স্নোয়ি মাউন্টেন এলাকায় হঠাৎ হঠাৎ রেডিয়ো সিগনাল হারিয়ে যাচ্ছে।"

"তা কী করে হয় হ্যারি?" স্ট্রাউস বলে উঠলেন, "এই পাতটা তো আড়াইশো কিলোমিটার দূরে পড়ে ছিল। আজই এখানে এসেছে আমাদের সঙ্গে।"

ব্যারি চুপ করে গেলেন। ঋতমের মনে অন্য একটা প্রশ্ন উঁকি দিচ্ছিল। এই ধাতব পাতটার সমগোত্রীয় কিছু আশপাশে কোথাও নেই তো?"

"হ্যালো ইয়াংম্যান, আর কত ঘুমোবে?"

আলতো ধাক্কা খেয়ে ধড়মড়িয়ে উঠে বসল ঋতম। ঢুলুঢুলু চোখে দেখল, সামনে ব্যারি, দু'হাতে দু'খানা ধূমায়িত কফিমগ। ডান হাতেরটা ঋতমকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, "একটু কড়া করে বানালাম। তোমার ঘুম চোঁ চোঁ দৌড় লাগাবে।"

সত্যিই তাই। এমন হাকুচ তেতো কফি ঋতম জন্মে খায়নি। তবে ফলটা হল জব্বর। নিদ্রাদেবী একলাফে পগার পার। মাথা জোরে জোরে ঝাঁকিয়ে ঋতম জিজ্ঞেস করল, "বাকিরা কি উঠে পড়েছেন?"

"অনেকক্ষণ। স্ট্রাউস তো হেক্টরকে নিয়ে মর্নিংওয়াক সেরে এল। প্রোফেসর জোয়ারদারও গিয়েছিলেন সঙ্গে। টাউন দেখতে। একমাত্র ম্যাডামই বোধহয় এখনও...।" একটু থমকে থেকে ব্যারি বললেন, "এনিওয়ে, জলদি জলদি রেডি হয়ে নাও। আমাদের আর সময় নষ্ট করা চলবে না। এক্ষুনি রওনা দিতে হবে।"

"কোথায় স্যার?"

"জিন্ডাবাইন। রেডিয়ো সিগনালের ব্যাপারটা দেখব। প্লাস, মিসিং পার্সন দুটোর ব্যাপারে খোঁজখবরও করতে হবে।"

"সিগনালের গোলমালের সঙ্গে দুটো লোক হারিয়ে যাওয়ার কি সম্পর্ক আছে স্যার?"

"আপাতভাবে নেই। তবে ইউ এফ ও-র ধারণাটা যদি সঠিক হয়,

দুটো ঘটনার মধ্যে যোগসূত্র তো থাকতেই পারে। আর ব্যাপারটা স্টাডি করার জন্য জিন্ডাবাইনই আসল স্পট। সিগনালের সমস্যাটা তো ওখানেই সবচেয়ে বেশি। এবং লোক দুটোও ওখান থেকেই...।" ব্যারি কথা থামিয়ে ফের তাড়া লাগালেন, "চলো, চলো। গিজার অন করা আছে, চটপট স্নানটা সেরে নাও।"

উৎসাহে যেন টগবগ ফুটছেন ব্যারি। ঋতম ভেবেই পাচ্ছিল না, এই বিজ্ঞানীরা কোন ধাতুতে গড়া। কাল রাত তিনটে অবধি তিনমাথা ঠায় রহস্যময় বস্তুটির সামনে বসে। যদি আর একবার সেই নীল আলো ঠিকরোয়...। কিছুই ঘটল না, তবু কারও কোনও খেদ নেই, ক্লান্তি নেই। ম্যাডাম ঠেলে শুতে না পাঠালে বাকি রাতটুকুও বুঝি অপেক্ষায় থাকতেন। তারপরও ভোরবেলা উঠে প্রোফেসর স্ট্রাউস আর জটাধরস্যার চরকি খেয়ে বেড়াচ্ছেন। ব্যারিও দাড়িটাড়ি কামিয়ে, ফিটফাট হয়ে বেরোনোর জন্য প্রস্তুত। বিজ্ঞানের প্রতি ভীষণ ভীষণ টান থাকলে তবেই না এই প্রাণশক্তি আসে!

ঋতমও আর সময় নিল না। মিনিট পনেরোর মধ্যে তৈরি হয়ে এসে দেখল, গাড়ি বেরোব বেরোব করছে। রত্নমালা যে রত্নমালা, তিনিও আসন গ্রহণ করেছেন। হেক্টরও যথারীতি ঠিক তাঁর পিছনে। জিভ ঝুলিয়ে বড় বড় শ্বাস ফেলছে এবং রত্নমালাও যথারীতি কাঠ হয়ে বসে।

মোটেল ছেড়ে বেরোল গাড়ি। কাচের বাইরে চোখ রাখল ঋতম। কাল রাতে সেভাবে বোঝা যায়নি, কুমা শহরটা সত্যি ভারী সুন্দর তো! ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট, দোকানপাট, গির্জা, স্কুল, টাউন হল, সব মিলিয়ে ঠিক যেন পটে-আঁকা ছবি। দূরে দেখা যায় সার সার পাহাড়। মাথাগুলো বরফের চাদরে ঢাকা। সার্থক নাম বটে, স্নোয়ি মাউন্টেন। সেই মেলবোর্নের শহরতলি থেকে শুরু হওয়া গ্রেট ডিভাইডিং রেঞ্জেরই অংশ। ওই স্নোয়ি মাউন্টেন থেকেই বেরিয়েছে

অজস্র নদী। ওখানেই অস্ট্রেলিয়ার উচ্চতম শৃঙ্গ মাউন্ট কশেউস্কু। আশ্চর্য, মাত্র সাত হাজার ফুট উঁচু ওই পাহাড়ের চূড়ায় সারা বছরই নাকি বরফ জমে থাকে।

বিজ্ঞানীদের অবশ্য নিসর্গশোভায় মন নেই এখন। বাম্পানার দেওয়া আজব বস্তুটাই ঘুরছে তাঁদের হাতে হাতে। বারবার নিরীক্ষণ করেও যেন আশ মিটছে না, যে যাঁর মতো ব্যাখ্যা খুঁজছেন টুকটাক। কখনও বা আলোচনা রীতিমতো উত্তপ্ত হয়ে উঠছে। কখনও একে অন্যের মতামত শুনছেন মন দিয়ে।

দেখতে দেখতে এসে গেল জিন্ডাবাইন। কুমা থেকে কতক্ষণই বা লাগে, মাত্র ঘণ্টাখানেক। মাঝে ব্রেকফাস্টের বিরতি না নিলে হয়তো আরও আগেই পৌঁছোনো যেত।

জিন্ডাবাইনে নেমে শুধু ঋতম নয়, রত্নমালা পর্যন্ত বিমোহিত। কী অপূর্ব জায়গা! পাহাড়-ঘেরা বিশাল এক হ্রদ। টলটল করছে নীল জল। হ্রদের পাড়ে শান্ত ছোট্ট শহর। গাঢ় নীল জলে ইতস্তত ছুটে বেড়াচ্ছে মোটরবোট। চলছে ওয়াটার স্কিয়িং। ডাঙাতেও ভ্রমণার্থী কম নেই, তবু যেমন শহরটার নির্জনতা ব্যাহত হচ্ছে না এতটুকু। সোনালি রোদ মেখে ঝিকমিক করছে চারদিক। অপরূপ এক শীতলতাও ছড়িয়ে আছে সর্বত্র।

বড়সড় তথ্যকেন্দ্রটার সামনে গাড়ি রেখেছেন ব্যারি। সেখান থেকেই চেঁচিয়ে ডাকলেন, "আসুন, দরকারি কাজটা আগে সেরে নিই।"

লেকের পাশ থেকে নড়ার একটুও ইচ্ছে ছিল না রত্নমালার। তবু ঋতমের সঙ্গে ফিরলেন পায়ে পায়ে। ইনফর্মেশন সেন্টারের সামনে প্রকাণ্ড এক স্ট্যাচু, ঘাড় উঁচু করে মূর্তিটা দেখতে দেখতে জিজ্ঞেস করলেন, "ইনি কে?"

জটাধরস্যার একটা চুরুট ধরিয়ে জোর টান মেরে বললেন,

"ব্যাঞ্জো প্যাটারসন, একজন কবি। অস্ট্রেলিয়ায় ইনি প্রায় জাতীয় কবির মর্যাদা পান।"

ঋতম প্রশ্ন করল, " 'দ্য ম্যান ফ্রম স্নোয়ি রিভার'— এঁরই লেখা না?"

"হ্যাঁ, ব্যাঞ্জো প্যাটারসনের বেশিরভাগ লেখাই এই অঞ্চলকে ঘিরে। বিশেষত বুশরেঞ্জারদের উপর।"

রত্নমালা বললেন, "কাল ডক্টর স্ট্রাউসও বুশরেঞ্জারদের কথা বলছিলেন না? তারা কারা? অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসী?"

"না না, সাহেবই। তবে অন্য টাইপ। অস্ট্রেলিয়ায় প্রথমে যেসব সাদা চামড়ারা এসেছিল, তাদের বেশিরভাগই ছিল দাগি আসামি। তাদের দিয়ে অস্ট্রেলিয়ার রাস্তাঘাট বানানো হয়েছে, ঘরবাড়ি তৈরি করানো হয়েছে...। প্রচণ্ড পরিশ্রমে কাহিল হয়ে ওইসব অপরাধীদের অনেকে পালিয়ে আসত এদিককার নির্জন অঞ্চলে। জঙ্গলে আশ্রয় নিত। বছরের পর বছর জঙ্গলে থাকতে থাকতে তারা একটু অন্য ধাতের মানুষ হয়ে গিয়েছিল। যেমন সাহসী, তেমনই লড়াকু। অনেকটা আমেরিকার সেই কাউবয় ফিল্মি হিরোদের মতো। এখনও তাদের বংশধররা এদিক-ওদিক ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। অস্ট্রেলিয়ায় এদেরই নাম বুশরেঞ্জার। এরা আজও...।"

একবার বক্তৃতা শুরু করলে জটাধরস্যারকে থামানো কঠিন। ব্যারি অধৈর্যভাবে বললেন, "বুশরেঞ্জারদের কাহিনি পরে শোনালে হয় না প্রোফেসর? সময় গড়িয়ে যাচ্ছে...!"

জটাধরস্যারের হুঁশ ফিরল। বললেন, "হ্যাঁ, তাই তো!"

ব্যারির পিছনে পিছনে সকলে এবার ঢুকলেন তথ্যকেন্দ্রে। রত্নমালা প্রায় ছুটে গেলেন কিউরিয়ো শপে। বাকিরা কাউন্টারের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন।

টেবিলের ওপারে এক মোটাসোটা মহিলা। ব্যারি সংক্ষেপে

নিজেদের পরিচয় দিতে মহিলা যেন তটস্থ। ভারী বিনয়ের সঙ্গে বললেন, "বলুন, কীভাবে আপনাদের সাহায্য করতে পারি?"

ব্যারি বললেন, "শুনলাম, গত দশ-বারো দিনে জিন্ডাবাইন থেকে নাকি দু'জন মানুষ নিখোঁজ হয়েছেন?"

"টাউন জিন্ডাবাইন থেকে নয় স্যার। লেক জিন্ডাবাইন থেকে।"

"হ্যাঁ, খবরটা সেরকমই। তাঁদের পরিচয় কি আপনার জানা আছে?"

"শিয়োর!" মহিলা গড়গড় করে যেন মুখস্ত বলে চললেন, "যিনি প্রথম নিখোঁজ হয়েছিলেন, তাঁর নাম গর্ডন স্টিল। ক্যানবেরায় তিনি ব্যাঙ্কে চাকরি করেন। আর পরশু থেকে যাঁকে পাওয়া যাচ্ছে না, তিনি হলেন সিডনির এক স্কুলটিচার। নাম বরিস গ্রে।"

জটাধর স্যার ঘাড় হেলিয়ে স্ট্রাউসকে বললেন, "বুঝতেই পারছ, দু'জনের কেউই বুশরেঞ্জার নন।"

স্ট্রাউস মাথা দোলালেন, "তাই তো দেখছি।"

ব্যারি ফের মহিলাকে প্রশ্ন করলেন, "ঘটনা দুটোর ডিটেল কি একটু দিতে পারবেন?"

"হ্যাঁ স্যার। দু'জনেই ছোট মোটরবোট ভাড়া নিয়েছিলেন। দু'জনের কাছেই মাছধরার জিনিসপত্র ছিল। সোজা চলে গিয়েছিলেন লেকের একেবারে উলটো পাড়ে। বোধহয় নির্জনে মাছধরার ইচ্ছে ছিল। সন্ধের পরও ফিরছেন না দেখে মোটরবোটের মালিক চিন্তিত হয়ে পড়েন এবং পুলিশকে খবর দেন। তারপর পুলিশ তন্নতন্ন করে খুঁজেও তাঁদের কোনও সন্ধান পায়নি। মোটরবোট দুটোও আশ্চর্যরকমভাবে উধাও।"

"পুলিশ কি ডুবুরি নামিয়েছিল?"

"না স্যার। তাঁরা যে লেকের ঠিক কোন জায়গাটায় ছিলেন, তা-ই তো কেউ জানে না। এত বিশাল লেক, পাহাড়ের ওপারে লেকটা

ঘুরেও গিয়েছে। ওদিকটা তো এখান থেকে দেখাও যায় না। সঠিক স্পট জানা না থাকলে ডুবুরি নামবে কোথায়?"

ব্যারি যেন ঠিক সন্তুষ্ট হলেন না উত্তরটায়। ঘনঘন মাথা নাড়ছেন। একটুক্ষণ পর স্ট্রাউস জিজ্ঞেস করলেন, "আচ্ছা, দু'জনের কারও বডি কি ভেসে ওঠেনি?"

"না।" বলেই মহিলা খানিক থমকালেন। "তবে একটা গুজব কিন্তু হাওয়ায় ভাসছে স্যার।"

"কীরকম?"

"গর্ডন স্টিল... মানে প্রথম মানুষটিকে নাকি স্নোয়ি মাউন্টেনে ঘুরে বেড়াতে দেখা গিয়েছে।"

"সে কী? কে দেখেছে?"

"সেটা বলতে পারব না স্যার। তবে অনেকেই বলাবলি করছে। আপনারা পুলিশ স্টেশনে গিয়ে ব্যাপারটা যাচাই করতে পারেন।"

"তা তো যাবই," ব্যারি কয়েক পা গিয়েও ঘুরে দাঁড়ালেন, "আর-একটা প্রশ্ন ছিল ম্যাডাম।"

"কী?"

"এটা কি সত্যি, জিন্ডাবাইনে মাঝে মাঝে রেডিয়ো সিগন্যাল থাকছে না?"

"অত বলতে পারব না স্যার। তবে মোবাইল কানেকশান খুব গড়বড় করছে। শুধু যে নেটওয়ার্ক থাকছে না তা নয়, মোবাইলও পুরোপুরি অচল হয়ে যাচ্ছে। বিশেষ করে রাত ন'টার পর।"

ব্যারি, স্ট্রাউস আর জটাধরস্যার তিনজনে একসঙ্গে ঋতমের দিকে তাকালেন। ঋতমের বুকটা ধড়াস করে উঠল। জিন্ডাবাইনেও মোবাইলে একই উপসর্গ! তার আন্দাজটা কি তা হলে মিলে যাচ্ছে?"

পুলিশ স্টেশনের চেহারা যে এত ঝকঝকে হয়, ঋতমের

কল্পনাতেও ছিল না। জীবনে একবারই মাত্র সে থানায় ঢুকেছে। কলকাতায়। বাসে পকেটমারের হাতে মানিব্যাগ খুইয়েছিল, তার রিপোর্ট লেখাতে। তখন যা রূপ দেখেছে থানার! অপরিচ্ছন্ন ঘরদোর, পুরনো পুরনো চেয়ার-টেবিল, দেওয়ালে ঝুল, নোংরা ফাইলপত্র, উৎকট স্বরে পুলিশ কাকে যেন ধমকাচ্ছে! অথচ এখানে কী দিব্যি আধুনিক অফিস। কাচের দরজা, টেবিলে টেবিলে কম্পিউটার, জানলায় ভেনিশিয়ান ব্লাইন্ড, ছোট ছোট কিউবিকল, হল্লাগুল্লার বালাই নেই। গভীর মনোযোগে যাঁরা কম্পিউটারে বসে, তাঁদের পরনে হালকা নীল ইউনিফর্ম আর নেভি ব্লু টুপি না থাকলে পুলিশ বলে চেনাই দায়।

স্থানীয় পুলিশকর্তা চার্লস বিংহামের সঙ্গে কথা বলছিলেন ডক্টর স্ট্রাউস। বিংহামকে দশাসই বললেও কম বলা হয়, ছোটখাটো একটি পাহাড় বিশেষ। সাড়ে ছ'ফুটের উপর লম্বা, মানানসই চওড়া কাঁধ, ইয়া পুরুষ্টু গোঁফ। হাতের পাঞ্জা এত বিশাল যে, ঋতমের আস্ত মুন্ডুখানা তাঁর থাবায় ধরে যাবে। এহেন মানুষটি আগন্তুকদের পরিচয় জেনে যথেষ্ট বিস্মিত, খানিকটা বা সন্দিগ্ধও। ভুরু কুঁচকে জরিপ করছেন বিজ্ঞানীদের এবং অবশ্যই রত্নমালাকেও। শাড়ির উপর ঢলঢলে ওভারকোট আর কান-মাথা ঢাকা উলের টুপিতে তাঁকে দেখাচ্ছেও ভারী আজব।

রত্নমালাতেই দৃষ্টি রেখে বিংহাম বললেন, "আপনাদের আগমনের কারণটা কিন্তু এখনও বুঝে উঠতে পারলাম না, ডক্টর স্ট্রাউস। ঠিক কী চান বলুন তো? নিখোঁজ লোক দুটোর খবর নিতে এসেছেন? নাকি এখানকার মোবাইল পরিষেবা কেন বিঘ্নিত হচ্ছে, জানাটাই উদ্দেশ্য? অথবা আড়াইশো কিলোমিটার দূরে কোথায় কোন জঙ্গলে আগুন লেগেছিল, তার রহস্য উদ্ঘাটনে পা রেখেছেন এই জিম্ভাবাইনে?" বিংহামের স্বরে মাপা সম্ভ্রম। সঙ্গে একটা চোরা ব্যঙ্গও মিশে আছে যেন।

ডক্টর স্ট্রাউস অতশত খেয়াল করলেন না। সপ্রতিভ ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললেন, "ধরুন তিনটেই। পরে নতুন কিছু যদি ঘটে, তারও কারণ খুঁজব।"

একফালি পুলিশি গাম্ভীর্য বিংহামের মুখে উঁকি দিয়েই মিলিয়ে গেল। হেসে বললেন, "কিছু মনে করবেন না স্যার। নিরুদ্দিষ্ট মানুষদের খুঁজে বের করা কিন্তু বিজ্ঞানীদের কাজ নয়। পুলিশের ডিউটি পুলিশই নয় করল!"

"কিন্তু দু'-দুটো জলজ্যান্ত মানুষ হারিয়ে গেল, এখনও তাদের সন্ধান নেই...!'

"ওরা তো ডুবে গিয়েছে স্যার।"

"কী করে নিশ্চিত হলেন? বডি পাওয়া যায়নি, ডুবুরিও তো নামালেন না?"

"অসুবিধে ছিল স্যার। লেকের ঠিক কোন জায়গায় ডুবুরি নামবে, সেটা স্থির করাই তো মুশকিল। আন্দাজে আন্দাজে ডুবুরি নামালেও কোনও লাভ হত কি না সন্দেহ।"

"কেন?"

"জিন্ডাবাইন লেকের ইতিহাসটা তা হলে বলতে হয়।" বিংহাম চেয়ারে হেলান দিলেন, "এখন যেখানে হ্রদ দেখছেন, জায়গাটা ছিল একটা গোটা শহর। বাড়ি-ঘর, গির্জা, স্কুল, কী না ছিল সেখানে। অনেক অনেক বছর আগে পাহাড় থেকে নামা নদীটায় প্রবল এক বন্যা হয়। ব্যস, শহরও খতম। চিরকালের মতো জলের তলায়। এখনও হ্রদের নীচে শহরের ধ্বংসাবশেষ টিকে আছে, বাড়ির ভাঙা অংশ, পাথরের দেওয়াল...। ওরই কোনও ফাঁকে বডি দুটো যদি ঢুকে থাকে, ডুবুরির পক্ষে বের করা সম্ভব?"

"কিন্তু তারা ডুবল কীভাবে?" জটাধরস্যার ফস করে প্রশ্ন জুড়েছেন, "সাঁতার না জেনেই কি বোট নিয়ে নেমেছিল?"

"না স্যার, দু'জনেই সাঁতার জানত। গর্ডন তো রীতিমতো দক্ষ সাঁতারু ছিল। ক্যানবেরার বাড়িতে প্রাইজ-মেডেলও আছে।"

"তা হলে তো ডুবে মরার থিয়োরি খাটছে না। যদি না আত্মহত্যা করে থাকে।"

"সেই আশঙ্কাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে স্যার। খুব শিগগিরই পুলিশের তদন্তের জালে সত্য ধরা পড়বে। গর্ডন আর বরিসের নেচার কেমন ছিল, মানসিক কোনও অসুখে ভুগছিল কি না, সবই খতিয়ে দেখছি। বোট দুটো কোথায় গেল, সেটাও তো ভাবা দরকার।"

"উম!" ব্যারি মাথা নাড়লেন, "বোটসুদ্ধ আত্মহত্যা করা কি সম্ভব?"

"ওই একটি পয়েন্টই তো খচখচ করছে।"

"আরও একটা পয়েন্ট কিন্তু আছে মিস্টার বিংহাম।" ব্যারির চোখ পিটপিট, "একটা খবর চারদিকে খুব শোনা যাচ্ছে। আশা করি, আপনার কানেও পৌঁছেছে?"

"কী বলুন তো?"

"গর্ডন স্টিল নাকি এখনও জীবিত? তাকে নাকি স্নোয়ি মাউন্টেনে দেখা গিয়েছে?"

"যত্তসব গুজব।" বিংহাম নাক কুঁচকোলেন। সামান্য ভেবে নিয়ে বললেন, "দেখুন স্যার, রটনা থেকে বিজ্ঞানীরা হয়তো নতুন নতুন চিন্তার খোরাক পান। তবে পুলিশকে তো ওসবে ধ্যান দিলে চলে না। আমাদের তো আগে যুক্তি দিয়ে ভাবতে হয়।"

"তার মানে গর্ডন স্টিলকে দেখতে পাওয়ার সংবাদটি মিথ্যে?"

"অবশ্যই। যে লোকটি দেখেছে বলে দাবি করছে, সে তো বোটমালিক। তার মোটরবোট নিয়েই তো গর্ডন বেরিয়েছিল। নৌকোর শোকে স্টিভের এখন মাথা খারাপ, কী দেখতে কী দেখেছে...। তা ছাড়া স্টিভের কথায় অনেক ফাঁকও আছে।"

"কীরকম?"

"প্রথমত, স্টিভ হঠাৎ কেন স্নোয়ি মাউন্টেনে গেল, তার কোনও প্রপার রিজন নেই। বলছে, উইকএন্ডে বেড়াতে গিয়েছিল, তবে আমার বিশ্বাস হয় না। সেকেন্ডলি, গর্ডন নাকি একটা ভ্যালিমতো জায়গায় দাঁড়িয়ে ছিল, স্টিভ তাকে দেখতে পেয়েই ডাকে, অথচ গর্ডন ভ্রূক্ষেপ না করে সেখান থেকে সরে যায়। স্টিভ নাকি গাড়ি থেকে নেমে সঙ্গে সঙ্গে তাকে ধাওয়া করেছিল। কিন্তু ততক্ষণে পাথরের আড়ালে গর্ডন উধাও। এদিক-ওদিক অনেক দৌড়োদৌড়ি করেও স্টিভ আর তার হদিশ পায়নি।" বলতে বলতে থেমেছেন বিংহাম। বৈজ্ঞানিকদের প্রতিক্রিয়া লক্ষ করছেন। ঠোঁটে পাতলা হাসি ফুটিয়ে বললেন, "এইসব আজগুবি কাহিনি আমায় বিশ্বাস করতে বলেন?"

"স্টিভই বা আষাঢ়ে গল্প ফাঁদতে যাবে কেন মিস্টার বিংহাম?"

"স্রেফ চাঞ্চল্য বাড়াতে। তা ছাড়া একটা কারণ তো আছেই। গর্ডন বেঁচে থাকলেই তো স্টিভের সুবিধে। বিমা কোম্পানির কাছে তা হলে দাবি করতে পারবে, গর্ডন নৌকোটা চুরি করে পালিয়েছে। ওই হালকা তরণী টেনে পাড়ে তোলা মোটেই কঠিন নয়, সুতরাং চুরির গল্পটা অসম্ভব লাগবে না। কিন্তু নৌকোডুবি হয়ে থাকলে তো ক্ষতিপূরণ সহজে মিলবে না। নৌকোয় কোনও যান্ত্রিক ত্রুটি ছিল কি না, স্টিভকে প্রমাণ করতে হবে। অতএব গর্ডন জ্যান্ত আছে, এমন একটা গল্প চাউর করে দাও। পুলিশ কাল্পনিক গর্ডনকে খুঁজে বেড়াক, আর ওদিকে স্টিভ ক্ষতিপূরণের টাকাটা হাতিয়ে নিক।"

"আহা, গর্ডন যে সত্যিই আছে, এটাও তো স্টিভকে প্রমাণ করতে হবে?"

"সে দায় তো স্টিভের নয়? কেউ আপনার জিনিস চুরি করে পালালে, যতক্ষণ সে না ধরা পড়ে, ততক্ষণ কি আপনার ক্লেম

আটকে থাকে?" বিংহাম সামান্য ঝুঁকলেন। টেবিলে পেপারওয়েট ঘোরাতে ঘোরাতে বললেন, "স্টিভকে অবিশ্বাস করার আরও কারণ আছে। ও যা গর্ডনের বর্ণনা দিল, তার সঙ্গে গর্ডনের নেচার আদৌ মেলে না। আমি গর্ডনের বাড়ি গিয়ে যা জেনেছি, সেই অনুযায়ী গর্ডন অত্যন্ত আমুদে, হুল্লোড়ে আর মিশুকে ধরনের। ভাল চাকরি-বাকরিও করে। সেই গর্ডন সামান্য একটা বোট চুরি করে স্নোয়ি মাউন্টেনে গিয়ে লুকিয়ে থাকবে, আর স্টিভকে দেখে মুখ ফিরিয়ে হাঁটা দেবে..., এটা আমি ঠিক হজম করতে পারছি না। তাও তো আমি স্নোয়ি মাউন্টেনে টিম পাঠিয়েছি। তবে তারা এখনও কিছুই ট্রেস করতে পারেনি।"

"আচ্ছা, এমন নয় তো, স্টিভ যাকে দেখেছে সে হয়তো গর্ডনই?" রত্নমালা আলোচনার মাঝে দুম করে একটা বোমা ফাটালেন, "অথচ সে হয়তো গর্ডন নয়?"

বিংহাম হতচকিত মুখে বললেন, "মানে?"

"গর্ডন হয়তো সত্যিই মৃত! তার ভূত এখন স্নোয়ি মাউন্টেনে ঘুরে বেড়াচ্ছে?"

কয়েক সেকেন্ড বিংহামের যেন বাক্যি ফুটল না। তারপর ঘাড় চুলকোতে চুলকোতে বললেন, "যাঃ, এমনটা হয় নাকি?"

"খুব হয়! আমাদের মধুপুরের বাড়িতে তো তিন-তিনখানা বুড়ো ভূত আছে। রোজ রাতে তারা ছাদে শীতলপাটি পেতে দাবা খেলে। কেউ চাল ফেরত নিলে এমন চেল্লামিল্লি শুরু করে, তা বলার নয়। আমাদের কেয়ারটেকার তো হুইসল বাজিয়ে থামায় তাদের।"

স্ট্রাউস আর ব্যারি চোখ চাওয়াচাওয়ি করছেন। জটাধরস্যার তো রীতিমতো বিরক্ত। গোমড়া গলায় বললেন, "অ্যাই, তুমি চুপ করবে? কতবার বলেছি, আমরা বিজ্ঞানী, অশরীরী আত্মাফাত্যা আমরা মানি না।"

বিংহাম বললেন, "আমার কিন্তু মনে হচ্ছে ম্যাডামের কথাই ঠিক। স্টিভ ব্যাটা গর্ডনের ভূতকেই দেখেছে।"

রত্নমালা উৎসাহিত হয়ে বললেন, "এবার বরিসেরও দর্শন মিলবে। যদি চান, ভূত ধরার একটা জব্বর মন্ত্র আপনাকে শিখিয়ে দিতে পারি।"

"কীরকম? কীরকম?"

জটাধরস্যারের ভ্রূকুটিকে কাঁচকলা দেখিয়ে হঠাৎ এক 'অং বং চং' শ্লোক আওড়াতে শুরু করলেন রত্নমালা। একটি বর্ণও বোধগম্য হচ্ছে না বিংহামের, তবু শুনছেন মুগ্ধ চোখে। ঘাড়ও দোলাচ্ছেন তালে তালে।

ওরকম একটা দৃশ্যের মাঝে ডক্টর স্ট্রাউস আর ব্যারির কেমন যেন কিংকর্তব্যবিমূঢ় দশা। জটাধরস্যার রাগে ফুলছেন। কোনওক্রমে চোয়ালে চোয়াল ঘষে সামলালেন নিজেকে। ঋতমের কানের কাছে মুখ এনে বললেন, "তোমার ম্যাডামকে সঙ্গে আনা কী গোক্ষুরি হয়েছে, বুঝতে পারছ? পথে আরও কত ভোগান্তি আছে কে জানে?"

ঠিক তখনই বিংহামের দরজায় এক চেনা মুখ। শ্রীমান বাম্পানা। পিঠে সেই রুকস্যাক, কাঁধে সেই ডিজিরিডু।

ঋতম চমকে উঠে বলল, "তুমি কোত্থেকে?"

বাম্পানার চকিত আগমনে সকলেই খুশি। হেক্টর তো আহ্লাদে ডগমগ। পুঁচকে লেজখানা নাচাচ্ছে অবিরাম। রত্নমালাও মহা পুলকিত। যাক, হেক্টর তা হলে এখন বাম্পানাকে নিয়েই ব্যস্ত থাকবে।

থানা থেকে বেরিয়ে জিন্ডাবাইন লেকের পাড়ে এসেছে ঋতমরা। হেক্টরকে আদর করতে করতে নিজের আকস্মিক আবির্ভাবের কারণ শোনাচ্ছিল বাম্পানা। কাল রাতে বোম্বালায় নামার পর থেকেই নাকি তার মনে হচ্ছিল, স্ট্রাউস-জটাধরস্যারদের সঙ্গ ছাড়া তার মোটেই উচিত হয়নি। আঠারোই এপ্রিল জঙ্গলে যে আজব আগুনটা জ্বলেছিল, বাম্পানা একাই তো তার প্রত্যক্ষদর্শী। অতএব বিজ্ঞানীদের কাজে সাহায্য করাটা তো তার কর্তব্য। তা ছাড়া হেক্টরের সঙ্গে থাকতে

পারবে, এটাও তো একটা উপরি পাওনা। ব্যস, এই সিদ্ধান্ত নিয়েই সকালে বাড়ি ছেড়ে সোজা কুমা। সেখানে অবশ্য হোটেলে-মোটেলে চরকি খেয়েছে খানিক, তবে জিন্ডাবাইনে পৌঁছে কোনও সমস্যাই হয়নি। ব্যারির গাড়ি আর হেক্টরকে দেখতে পেলে বাকিদের খুঁজতে কতক্ষণই বা লাগে? বিশেষ করে জিন্ডাবাইনের মতো ছোট্ট জায়গায়?

স্ট্রাউস স্মিত মুখে বললেন, "এসে ভালই করেছ হে! স্নোয়ি মাউন্টেন অঞ্চলটা নিশ্চয়ই তোমার চেনা?"

"হাতের তালুর মতো।" বাম্পানা শুভ্র দাঁত ছড়িয়ে হাসল, "এদিকের পাহাড় বাম্পানার বহুবার ঘোরা। স্নোয়ি মাউন্টেনের জঙ্গল খুব সুন্দর, কতবার থেকে গিয়েছে বাম্পানা।"

"ভেরি গুড! বাম্পানাই তা হলে আমাদের গাইড হোক!"

"উইথ প্লেজার, মিস্টার।"

ঋতম একটা জরুরি প্রশ্ন করার জন্য ছটফট করছিল। ফাঁক পেয়ে বলল, "আচ্ছা বাম্পানা, ওই ধাতব পাতখানা তোমার কাছে তো আঠারোই এপ্রিল থেকেই ছিল, তাই না?"

"উঁহুঁ, দু'দিন পর কুড়িয়ে পেয়েছি।"

"ও। ধাতব পাতটার কোনও বিশেষত্ব নজরে পড়েছিল কি?"

"কালই তো বললাম, ওটা মনস্টাররা ফেলে গিয়েছে, সেই যারা আকাশপথে উড়ে এসেছিল। অত চকচকে, কিন্তু কী হালকা, চেষ্টা করেও বেঁকানো যায় না!"

"ব্যস? আর কিছু খেয়াল করোনি? কখনও নীল আলো বেরোতে দেখেছ কি পাত থেকে?"

"না তো! অবশ্য পাতখানা তো সব সময় ব্যাগেই থাকত।" বাম্পানার চোখে কৌতূহল, "ওটা থেকে আলো বেরোয় বুঝি?"

"হ্যাঁ, কাল রাতে...!"

"বলেছিলাম। আমি বলেছিলাম, ওটা মনস্টারের ম্যাজিক প্লেট।"

বাম্পানা প্রায় নেচে উঠেছে, "আমার কথা মিলল তো? বিশ্বাস হল তো, সেই রাত্তিরে ভয়ংকর কিছু হানা দিয়েছিল জঙ্গলে?"

তেমন নতুন তথ্য না পেয়ে ঋতম যেন সামান্য নিরাশ। এদিকে ব্যারি তাড়া লাগাতে আরম্ভ করেছেন, "এক্ষুনি খেয়েদেয়ে রওনা না দিলে থ্রেড্‌বো পৌঁছে কোনও কাজ হবে না যে!" অগত্যা সদলবলে রেস্টুরেন্ট। এক প্লেট করে ফিশ অ্যান্ড চিপস খেয়ে পেট ঢাই। এবং তার পরেই যাত্রা শুরু।

থ্রেড্‌বো পৌঁছোতে খুব একটা সময় লাগল না। বড়জোর আধঘণ্টা। সমতল থেকে খানিক উঁচুতে জায়গাটা ভারী শান্ত। এখান থেকেই উঠে গিয়েছে কশেউস্কু পাহাড়ের পথ।

ছোট্ট জনপদ পেরিয়ে এক টিলার মাথায় এসে থামল গাড়ি। অবজারভেটরির সামনে। দরজা খুলে বেরোতেই ঋতমের যেন আর পলক পড়ে না। একদম কাছ দিয়ে বয়ে চলেছে এক পাহাড়ি নদী, দু'ধারটা তার কী সবুজ, কী সবুজ! গোটা থ্রেড্‌বোই তো ছেয়ে আছে পাহাড়ি জঙ্গলে। দেখা যায় মাউন্ট কশেউস্কুর চূড়া। বিকেলের আলো মেখে পাহাড়ের বরফ ঝকমক ঝকমক।

ব্যারি একাই গেলেন মহাকাশ পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রটির অন্দরে। ফিরেছেন মিনিটদশেক পর। সঙ্গে এক যুবক। ঋতমেরই বয়সি। রোগা, লম্বা, পরনে জিনস-পুলওভার। সমুদ্র-নীল চোখ দুটো বুদ্ধির দীপ্তিতে উজ্জ্বল।

গর্বিত মুখে ব্যারি বললেন, "এই আমার ছাত্র মার্ক নোয়েল্‌স। এখানকার অবজারভেটরির চার্জে আছে।"

তিন-তিনজন ডাকসাইটে বিজ্ঞানীর মুখোমুখি হয়ে মার্ক যেন সামান্য জড়সড়। বাম্পানা আর রত্নমালাকে দেখে বুঝি বা একটু বিস্মিতও।

ব্যারি ছাত্রকে বললেন, "কী কী পিকিউলিয়ার ঘটনা এখনও পর্যন্ত দেখেছ, এঁদের একটু খুলে বলো তো!"

মার্ক মাথা দুলিয়ে বলল, "সমস্যাটা শুরু হয়েছিল আঠারোই

এপ্রিল। রাত তখন দশটা আটান্ন। তখনই প্রথম একটা অচেনা রেডিয়ো সিগনাল পাই। আঠাশ মিনিট পর আবার একই সংকেত। আমি খুব একটা আমল দিইনি। কারণ, আপনারা তো জানেন, এমন অদ্ভুত অদ্ভুত সংকেত মহাকাশ থেকে আসা মোটেই অসম্ভব নয়। তারপর তিনদিন সেই সংকেতটা আর ছিল না। বাইশে এপ্রিল থেকে আবার আসতে লাগল। প্রায় রোজই।"

জটাধরস্যার জিজ্ঞেস করলেন, "সিগনালটা কি রোজ একই সময়ে আসে?"

"ঘড়ির কাঁটা মেপে নয়। তবে মোটামুটি রাত ন'টা থেকে দশটার মধ্যে। দ্বিতীয়বার আসে শেষ রাত্রে। সাড়ে তিনটে থেকে চারটে।"

স্ট্রাউস ভুরু কুঁচকে বললেন, "ওই দুটো সময়েই তো সেলফোন অচল হয়ে পড়ে, তাই না?"

"হ্যাঁ স্যার। এই ধরনের সংকেত আমি আগে কখনও রিসিভ করিনি।"

"সংকেতটা কোত্থেকে আসছে, সেটা কি ডিটেক্ট করা গিয়েছে?"

"এটাই তো স্যার খুব রহস্যময়। কখনও মনে হয় ভীষণ কাছ থেকে পাচ্ছি। পরমুহূর্তে মনে হচ্ছে, সংকেতের উৎস অনেক অনেক দূরে। আমার হিসেবমতো, এই গ্যালাক্সিরও বাইরে।"

"তুমি কি বলতে চাও, অন্য গ্যালাক্সি থেকে পাঠানো সিগনালে আমাদের পৃথিবীর এই কণামাত্র এলাকায় শুধু বিঘ্ন ঘটছে? এইটুকু জায়গার বাইরে তো স্যাটেলাইট যোগাযোগ ঠিকই থাকে।"

"তাই তো দেখছি স্যার।"

"কিন্তু এরকমটা কল্পনা করাও কি অবাস্তব চিন্তা নয়?"

"সেইজন্যই তো ভেবে ভেবে মাথা খারাপ হওয়ার জোগাড়।" মার্কের মুখে বেজার হাসি, "সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার, অন্য যে-কোনও নক্ষত্র থেকে আসা সিগনাল তো অন্যান্য অবজারভেটরিতেও ধরা

পড়বে। সেরকম কিন্তু ঘটছে না স্যার। আমি হাব্‌ল অবজারভেটরিতে পর্যন্ত যোগাযোগ করেছি, তারাও কেউ কিছু পায়নি। উলটে বলছে, আমাদের যন্ত্রপাতি নাকি খারাপ। ভুলভাল রিডিং দিচ্ছে।"

"হুম। তা সংকেতটা কতক্ষণ স্থায়ী হয়?"

"খুব বেশি হলে আট-দশ মিনিট। তবে এই ধরনের বেতারসংকেত তো আস্তে আস্তে ক্ষীণ হতে হতে একসময় মিলিয়ে যায়। এটা কিন্তু স্যার আচমকা আসে, আচমকাই ভ্যানিশ।"

"আর কোনও অদ্ভুত ঘটনা?"

"একটা আছে স্যার। তবে তার সঙ্গে আমাদের অবজারভেটরির বোধহয় সরাসরি কোনও সম্পর্ক নেই।"

"কী শুনি?"

"আজকাল ওই রেডিয়ো সিগনালের দৌলতে আমার তো রাতের ঘুম প্রায় চলেই গিয়েছে। মাঝে মাঝেই গভীর রাতে আজব এক দৃশ্য চোখে পড়ে। হঠাৎ হঠাৎ যেন মাউন্ট কশেউস্কুর কোনও কোনও জায়গায় একটা ফ্ল্যাশ হয়। যেন একটা জোরালো আলো জ্বলেই দপ করে নিভে গেল। জাস্ট তিন-চার সেকেন্ডের জন্য।"

"তাই নাকি? তা তুমি কি আলোর উৎসটা খোঁজার চেষ্টা করেছ?"

"অত রাত্তিরে? ওই দুর্গম পাহাড়ে? তবে দিনেরবেলা লোক পাঠিয়েছি। নিজেও গাড়ি নিয়ে ঘুরেছি। কোথাও কিচ্ছুটি বোঝার উপায় নেই।"

"তা হলে হয়তো তোমার দেখার ভুল!"

"রোজ রাত্তিরে ভুল দেখছি?"

"এমন তো হতে পারে, কোনও টুরিস্ট গ্রুপ আগুনটাগুন জ্বালাচ্ছে...?"

"সেটাও কি প্রত্যেক রাতে...? তা ছাড়া সঙ্গে সঙ্গে তো মিলিয়েও যায়!"

জটাধরস্যার বললেন, "ঘটনাটাকে অবহেলা কোরো না ফ্রেড। দাবানলের সঙ্গে আমি কিন্তু এর একটা মিল খুঁজে পাচ্ছি।"

ব্যারি বললেন, "তা হলে একটা কাজ করা যাক। আজ রাতটা বরং আমরা এখানেই থাকি। স্বচক্ষে সিগনালটাকে পরখ করে দেখি। প্লাস, আলোটাও যদি চোখে পড়ে...!"

সিদ্ধান্ত নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নামানো হল গাড়ি থেকে। অবজারভেটরির দোতলায় মার্কের কোয়ার্টার। বেশ বড়। সেখানেই বন্দোবস্ত হল রাত্রিবাসের। হেক্টরকে খাইয়ে দাইয়ে বাম্পানা তাকে নিয়ে হাঁটতে গেল নদীর ধারে। সারাদিন পর বিশ্রামের সুযোগ পেয়ে রত্নমালা একটু গড়িয়ে নিলেন বিছানায়। স্ট্রাউস আর জটাধরস্যার গেলেন শহরে, রাতের খাবারদাবার আনতে। একেই মার্কের বাড়িতে সবাই ভিড় জমিয়েছেন, এর পর তাকে আরও বিড়ম্বনায় ফেলতে কোনও অধ্যাপকই রাজি নন।

সাড়ে আটটার মধ্যে নৈশাহারের পালা শেষ। সবাই মিলে উঠলেন তিনতলায়। পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রের মূল কক্ষে। প্রকাণ্ড একটি টেলিস্কোপ ছাড়াও সেখানে আছে আরও নানান আধুনিক যন্ত্রপাতি। বেতারসংকেত গ্রাহক, প্রেরক, বর্ণালীবীক্ষণ যন্ত্র, আলোকীয় তাপমান যন্ত্র, এরকম আরও কত কী যে...!

ঋতম টেলিস্কোপে চোখ রেখে দেখছিল রাতের আকাশটাকে। এত পরিষ্কার নভোমণ্ডল! কোটি কোটি নক্ষত্র ফুটে আছে! চেনা তারাগুলোকে খুঁজছিল ঋতম। কই, পাচ্ছে না তো! ধ্রুবতারাটাই যে কোথায় গেল?

হঠাৎ ঋতমের মনে পড়ল, সে এখন দক্ষিণ গোলার্ধে। এখানকার আকাশ আলাদা, এখানে ধ্রুবতারা নেই।

ন'টা বেজে দশ। মার্ক ডাকল ঋতমকে। এসে গিয়েছে অচিন সংকেত।

জটাধরস্যার, ব্যারি আর স্ট্রাউস ঝুঁকে দেখছেন তরঙ্গটাকে। বিপ-বিপ, বিপ-বিপ শব্দ বাজছে গ্রাহকযন্ত্রে। ঋতম দাঁড়াতে গিয়েও কী ভেবে ছুটল দোতলায়।

মিনিট দুয়েকের মধ্যে ঋতমের হাঁকাহাঁকিতে গোটা দলটাই দোতলায় নেমেছেন। ছ'জোড়া চোখই নিষ্পলক! দেখছেন সেই অপরূপ দৃশ্য!

ধাতব প্লেটে ফের সেই নীলাভ দ্যুতি! নীলচে আলোয় ভরে গিয়েছে গোটা ঘর!

মাত্র কয়েক মিনিট। আলো মিলিয়ে গেল। ধাতব পাত আবার নিথর।

কী আশ্চর্য, বেতার গ্রাহকযন্ত্রে অজানা সংকেতটাও আর নেই!

নিরীক্ষণ কেন্দ্রের কাচ-ঘেরা ঘরখানায় তিন বিজ্ঞানী ধন্দমাখা মুখে বসে। কেউ টুঁ শব্দটি করছেন না। ধাতবপাত আর অচেনা সংকেতের যৌথ খেলা যেন তাঁদের স্বরযন্ত্র অচল করে দিয়েছে। বাম্পানা আর রত্নমালাও নীরব, শুধু চোখ চাওয়াচাওয়ি করছেন দু'জনে।

ঋতমও কম অবাক হয়নি। তবে ভিতরে ভিতরে একটা পুলকও জাগছে যেন। কুমায় হোটেলরুমে ধাতবপাতের নীলাভ দ্যুতির সে একাই প্রত্যক্ষদর্শী ছিল। স্যারদের জানিয়েও ছিল সবিস্তার। হয়তো তাঁরা বিশ্বাসও করেছিলেন। তবু বিজ্ঞানের ছাত্র হিসেবে ঋতমের একটা খচখচানি তো থাকেই। একজন কোত্থেকে কী দেখেছে বলল, তা দিয়ে তো গবেষণা এগোয় না। যদি ওই নীলচে আলোটির আর দর্শন না মেলে, সে নিজের কাছেই তো নিজে বেইজ্জত হয়ে যাবে। তিন বাঘা বাঘা প্রোফেসরই বা তার সম্পর্কে কী ধারণা করবেন? ভাবতেই পারেন, উদ্ভট তথ্য দিয়ে তাঁদের বিভ্রান্ত করছে ঋতম!

যাক, এবার ঋতম নিশ্চিন্ত। প্রমাণ সে দিতে পেরেছে। এখন তিন অভিজ্ঞ মাথা নিজের মতো করে ভাবুন।

ধাতবপাতখানা স্ট্রাউসের হাতে। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আবার দেখছেন

জিনিসটাকে। সাবধানে টেবিলে রেখে তিনিই প্রথম কথা বললেন, "ব্যাপারটা তো ক্রমশ জটিল হয়ে পড়ছে জে-জে! কোন ধাঁধাটা নিয়ে এগোব, সেটাই তো ঠাহর করতে পারছি না।"

"আমার তো উলটোটাই মনে হচ্ছে ফ্রেড।" জটাধরস্যারের স্বর ফুটল, "সবক'টা ঘটনাই এবার যেন একটা সুতোয় গাঁথা যাচ্ছে।"

"কীরকম?"

"আজব এক দাবানল..., জঙ্গলের যেখানে আগুন লেগেছিল, সেখানে কুড়িয়ে পাওয়া ধাতবপাত...! সেই ধাতবপাত থেকে বেরোল আলো...! ওই আলোর সঙ্গে একই সময়ে রেডিয়ো সিগনাল...! ঠিক তখনই একটি নির্দিষ্ট জায়গায় স্যাটেলাইট যোগাযোগে গন্ডগোল। এগুলো থেকে আমরা কী সিদ্ধান্তে পৌঁছোতে পারি? মূল ঘটনা ঘটেছে একটাই। অথবা এখনও ঘটছে। এবং আমরা যা দেখছি, শুনছি, সবই সেই মূল ঘটনার সঙ্গে কার্যকারণ সূত্রে যুক্ত।"

"হুম। এ তো আর এখন মেনে নিতে অসুবিধে নেই।" ব্যারিও নড়ে বসলেন। কপালে ভাঁজ ফেলে বললেন, "কিন্তু সেই মূল ঘটনাটা কী?"

বাম্পানা বলল, "আপনারা বাম্পানার কথাটা কেন আমল দিচ্ছেন না? বলছি তো, আকাশ থেকে মনস্টাররা নেমেছিল। তারা বোধহয় ফিরে যায়নি, কাছে পিঠে কোথাও ঘাঁটি গেড়েছে।"

"উঁহুঁ, মনস্টার নয়। ফ্লায়িং সসার।" রত্নমালাও আর চুপ থাকতে পারলেন না। চোখ ঘুরিয়ে বললেন, "নির্ঘাত মহাকাশযানে চেপে অন্য গ্রহের জীব হানা দিয়েছে পৃথিবীতে।"

মাথা নেড়ে জটাধরস্যার বললেন, "আমি কারও কথাই আর পুরোপুরি উড়িয়ে দিচ্ছি না। তবে সঠিক ব্যাপারটা কী, সেটা তো খুঁজে বের করতে হবে।"

"এ তো জলবৎ তরলং।" রত্নমালার ঠোঁটে বিজ্ঞ হাসি, "দেখো

গে যাও, চারপাশে হয়তো আরও ফ্লায়িং সসার ঘুরপাক খাচ্ছে। সিগনাল টিগনালগুলো তাদের সঙ্গেই খবর চালাচালি...!"

"কী খবর?"

"সেটাও কি আমি বলে দেব? তোমরা তা হলে আছ কী করতে?"

গিন্নির মুখঝামটায় জটাধরস্যার মুহূর্তের জন্য থমকালেন। ভাবলেন কী যেন। তারপর রত্নমালাকে উপেক্ষা করে স্ট্রাউসকে বললেন, "হ্যাঁ, তোমায় যা বলছিলাম...। একটা ঘটনাই যা এখনও খাপছাড়া ঠেকছে।"

স্ট্রাউস বললেন, "গর্ডন আর বরিসের মিসিং হওয়ার কথা বলছ?"

"একদম ঠিক। সিগনাল, আলো, বুশফায়ার, কোনও কিছুর সঙ্গেই ওটাকে মেলানো যাচ্ছে না।"

ঋতম উৎসাহের সঙ্গে বলল, "তার উপর আবার একজনের ফিরে আসার গল্পও আছে।"

"ওটাকে আমরা এখন ধরছি না। হয়তো ওটা স্টিভেরই রটনা। তবু কেন যেন লোক দুটো লেক জিন্ডাবাইনে ডুবে মরেছে, মানতে আমার মন সরছে না।"

"তা হলে গেল কোথায়?"

"সেটাই তো ভাবাচ্ছে।" জটাধরস্যার টেরিয়ে একবার রত্নমালাকে দেখলেন, একবার বাম্পানাকে। খানিক ব্যঙ্গের সুরেই বললেন, "যদি না ফ্লায়িং সসার লোক দুটোকে নিয়ে চম্পট দিয়ে থাকে অথবা বাম্পানার মনস্টার তাদের গিলে ফেলে থাকে?"

পরিহাসটুকু গায়ে না মেখে বাম্পানা হো হো হাসছে। রত্নমালার মুখ কিন্তু পলকে থমথমে। একটা ঝড় উঠছে টের পেয়েই বুঝি ব্যারি তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গ ঘুরিয়েছেন, "আজ রাত্তিরে তা হলে আমাদের আর কী কাজ?"

ব্যারির ছাত্র মার্ক নোয়েল্‌স এতক্ষণ নিঃশব্দে শুনছিল

কথোপকথন। গলা ঝেড়ে বলল, "শেষ রাত্তিরে আর-একবার তো সিগনাল আসবে। দেখবেন নিশ্চয়ই?"

"মিড নাইটে একটা ফ্ল্যাশও হয় বলছিলে? পাহাড়ে?"

"অপেক্ষা করলে সেটাও হয়তো দেখতে পাবেন।"

"তা হলে আজ রাত্তিরটা জাগিই, কী বলো?"

রত্নমালার মোটেই রাত্রি জাগরণে আগ্রহ নেই। ছোট একটা হাই তুলে বললেন, "যা খুশি করো তোমরা। সারাদিন প্রচুর হানটান হয়েছে, আমি বাপু শুতে চললাম।"

দোতলায় চলে গেলেন রত্নমালা। সবে রাত দশটা বাজে। মাঝরাতের আগে কিছুই ঘটার সম্ভাবনা নেই, এখন শুধুই প্রতীক্ষা। মার্ক কফি বানিয়ে আনল, চুমুক দিচ্ছেন সবাই। কথাও চলছে টুকটাক। তবু যেন সময় কাটে না। বাম্পানা তো উসখুস করছে রীতিমতো, বন্ধ ঘরে দীর্ঘক্ষণ নিষ্কর্মা বসে থাকা বুঝি তার ধাতেই নেই। হঠাৎ একসময় বলল, "আমি কি তোমাদের একটু আনন্দ দিতে পারি?"

ঋতম বলল, "কীভাবে?"

"ডিজিরিডুটা নিয়ে আসি। বাজিয়ে শোনাই।"

সম্মতির অপেক্ষা না করেই বাম্পানা পলকে উধাও। ফিরল লম্বাচওড়া চোঙার মতো বাদ্যযন্ত্রটি ঘাড়ে করে। বসে পড়ল মেঝেয়। দু'পা ছড়িয়ে। তারপর গলার শির ফুলিয়ে সুর তুলেছে বাজনায়। ভারী সুন্দর এক দুলুনি আছে সুরটায়। রাত নিঝুম, চরাচরে কোনও শব্দ নেই। এমন পরিবেশে দিব্যি একটা মায়া রচনা হচ্ছে যেন। আবিষ্টের মতো শুনছেন তিন বিজ্ঞানী, অজান্তেই তাল দিচ্ছে মার্ক, মাথা দোলাচ্ছে ঋতম।

বাম্পানা কতক্ষণ ডিজিরিডু বাজাল কে জানে, থামার পরেও যেন কারও ঘোর কাটছিল না। বেশ খানিকক্ষণ পর মার্কই প্রথমে হাততালি দিয়ে উঠল। তারিফের সুরে বলল, "তুমি তো চমৎকার বাজাও হে!"

বাম্পানা বেজায় খুশি। এতটুকু লজ্জা না পেয়ে সগর্বে বলল, "বটেই তো! বাম্পানার মতো ফুসফুসের জোর ক'জনের আছে?"

ব্যারি জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি শিখেছ কার কাছে?"

"সুর আমি নিজেই বানাই। তবে ফুঁ দেওয়ার প্রথম পাঠটি বাবাই দিয়েছিলেন।"

"তিনি কি এখন বোম্বালায়?"

"না। গত হয়েছেন। পরিবারে এখন শুধু দিদি আর মা। দিদি অবশ্য আমার চেয়েও কম বাড়িতে থাকে। বছরে এগারো মাসই তো তার কাটে রাজধানী ক্যানবেরায়। আমাদের নিজস্ব পার্লামেন্টে।"

ঋতম অবাক মুখে বলল, "তোমাদের নিজস্ব পার্লামেন্ট মানে?"

"জানো না বুঝি?" বাম্পানার চোখ গোল গোল, "আমরা তো সেই উনিশশো বাহাত্তর সাল থেকে অস্ট্রেলিয়ার পুরনো পার্লামেন্ট ভবনের সামনে তাঁবু গেড়ে রয়েছি।"

"কেন?"

"প্রতিবাদ জানাতে। একসময় অনেক আদিবাসী ছেলেমেয়েকে লেখাপড়া শেখানোর নাম করে তাদের পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়েছিল যে, সারাজীবনের মতো তারা আর কোনওদিন বাবা-মা ভাইবোনের কাছে ফিরে আসেনি। আদিবাসীরা তাই এখানে বসে সবাইকে মনের কষ্টটা জানায়।"

স্ট্রাউস গম্ভীর মুখে বললেন, "হ্যাঁ, এককালে বাম্পানাদের উপর অবিচার তো হয়েছেই। অথচ সত্যি বলতে কী, দেশটা তো আদতে ওদেরই। সাদা চামড়ার লোকরা তো পরে এসে ছড়ি ঘোরাচ্ছে।"

"ঠিকই তো। আমরা তো এসেছি তিন-চার হাজার বছর আগে। ইন্দোনেশিয়া না মালয়েশিয়া কোত্থেকে যেন। জন্তুজানোয়ারকে পোষ মানাতে জানতাম না, চাষবাসেও লবডঙ্কা, জঙ্গলে জঙ্গলে শিকার করে, মাছ ধরে আর ফলমূল খেয়ে পেট চলত। দিব্যি ছিলাম কিন্তু। এইসব

মিস্টাররা এসেই যত গোল পাকালেন।" স্ট্রাউস-ব্যারিকে দেখিয়ে বাম্পানা মিটিমিটি হাসছে। বিচিত্র ভঙ্গিতে মাথা দুলিয়ে বলল, "বাম্পানা অবশ্য পুরনো কাসুন্দি ঘাঁটতে ভালবাসে না। এখন যেমনটা আছি...!"

বাক্য শেষ হল না। মার্ক চেঁচিয়ে উঠেছে, "স্যার দেখুন। ওই যে...!"

ঝটিতি মুন্ডুগুলো ঘুরে গেল। পশ্চিমের পাহাড়ে মুহূর্তের জন্য একটা সাদা ঝলক, মুহূর্তে নিভেও গিয়েছে আলোটা। কশেউস্কু পাহাড় আবার মুখ ঢেকেছে আঁধারে।

ব্যারি বিস্মিত স্বরে বললেন, "ভারী অদ্ভুত তো! পাহাড়ে যেন বিদ্যুৎ চমকাল!"

জটাধরস্যার উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন। হাত মুঠো করে বললেন, "চলো ফ্রেড, এক্ষুনি গিয়ে দেখে আসি।"

মার্ক বলল, "অন্ধকারেই যাবেন স্যার? পাহাড়ি রাস্তা..."

স্ট্রাউস বললেন, "সো হোয়াট? গাড়িতে তো হেডলাইট আছে। না না, সময় নষ্ট করা ঠিক হবে না।"

ব্যারিও একপায়ে খাড়া। তিন বিজ্ঞানীর উৎসাহ দেখে ঋতম তো থ'! প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বেরিয়ে পড়া হল। দু'খানা গাড়ি নিয়ে। রত্নমালা সুখে নিদ্রা যাচ্ছেন, তাঁকে আর ডাকা হল না। ঘুমন্ত হেক্টরও রয়ে গেল পাশের ঘরে। দু'জনের কেউ এখন জেগে না উঠলেই মঙ্গল।

অ্যালপাইন ওয়ে ধরে পরপর চলেছে দুটো গাড়ি। একটিতে ব্যারি, স্ট্রাউস আর জটাধরস্যার। অন্যটিতে মার্কের সঙ্গে বাম্পানা আর ঋতম। মাঝে মাঝে পাহাড়ি বাঁক, ছুটন্ত গাড়ির গতি শ্লথ হচ্ছে সেখানে। শীতলতাও বুঝি বাড়ছে ক্রমশ। কাচ-তোলা গাড়ির নরম উষ্ণতায় বসে টের পাওয়া যায় না, তবে বেশ ভালই ঠান্ডা আছে বাইরে। মে মাসের শেষের দিকে এই অঞ্চলের তাপমাত্রা তিন-চার ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে তো নামেই।

স্টিয়ারিং ঘোরাতে ঘোরাতে মার্ক বলল, "স্যাররা তো

তেড়েফুঁড়ে বেরিয়ে পড়লেন...! এই ঘন শীতের রাতে কোথায় যে কী খুঁজবেন!"

বাম্পানা চিন্তিত মুখে বলল, "মনস্টাররা যদি এখনও পাহাড়ে ঘাপটি মেরে থাকে, তা হলে কিন্তু ঘোর বিপদ। লড়ব কী করে? অস্ত্রশস্ত্রই তো নেই!"

ঋতম বলল, "জটাধরস্যারের একখানা লেজার টর্চ আছে। বেরোনোর আগে পকেটে পুরেছেন, আমি দেখেছি। মারাত্মক টর্চ। নাম ডেস্ট্রো। ওই ডেস্ট্রো দিয়ে স্বচ্ছন্দে যে- কোনও জীবের মোকাবিলা করা যায়।"

মার্ক বলল, "ম্যাডামের অনুমান যদি সঠিক হয়..., অর্থাৎ গ্রহান্তরের প্রাণী যদি হানা দিয়ে থাকে, তা হলে তো লেজার বিম ক্রিয়া করবে কি না সন্দেহ!"

মার্কের আশঙ্কা অমূলক নয়। সত্যি তো! ধাতবপাতটার উপর ডেস্ট্রো তো কোনও কাজই করেনি। ভুরু কুঁচকে ঋতম বলল, "তোমার কি মনে হয় আলোটা ফ্লায়িং সসার থেকেই আসে?"

"কাল পর্যন্ত তো এমনটা ভাবিনি। এখন মগজ বলছে, অসম্ভব তো না-ও হতে পারে। আমাদের জ্ঞানের পরিধি অতি সামান্য। এই আদিঅন্তহীন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কোথায় কখন কী চলছে, আমরা তার কতটুকুই বা জানি! ক্ষুদ্র ক্ষমতা দিয়ে শুধু কয়েকটা সিগনাল ধরি, ব্যস। তাও সেগুলো ঠিক কোত্থেকে এল, সবসময় বোঝার সাধ্যও নেই।"

কথার মাঝেই ছোট্ট একটা নদী পেরোল গাড়ি। এবার পাশে পাশে চলেছে নদীটা। দু'ধারে যথারীতি উঁচু উঁচু গাছের মিছিল। জঙ্গলের চড়াই বেয়ে অল্প উঠে রাস্তা এখন খানিক সমতল।

তখনই এক সৃষ্টিছাড়া কাণ্ড! কোনও প্রস্তুতির অবকাশ দিল না, হঠাৎই হেঁচকি তুলে থেমে গেল গাড়িটা! হেডলাইট, ব্যাকলাইট, ড্যাশবোর্ডের আলো, সব নিভে গেল ঝুপ করে!

ব্যারি পিছনেই আসছিলেন। ঘ্যাচাং ব্রেক কষেছেন। অস্ট্রেলিয়ার রীতি ভুলে হর্ন বাজাচ্ছেন প্যাঁ পোঁ।

কিন্তু মার্কের গাড়ির হলটা কী? আর নড়ে না যে বড়?

প্রাণপণে স্টার্ট দেওয়ার চেষ্টা করল মার্ক। বারবার চাবি ঘোরাচ্ছে। নাঃ, গাড়ি চালু হওয়ার কোনও লক্ষণই নেই!

ব্যারি নেমে এসেছেন। অধৈর্য স্বরে বললেন, "ব্যাপার কী? দাঁড়ালে কেন?"

"গাড়িটা হঠাৎ বিগড়েছে স্যার।" মার্কের মুখ করুণ, "অপেক্ষা করার দরকার নেই, আপনারা বরং এগিয়ে যান।"

"আর তোমরা?"

"দেখি, কী করা যায়।"

কাঁধ ঝাঁকিয়ে ড্রাইভিং সিটে ফিরলেন ব্যারি। তবে এখনও বুঝি বিস্ময়ের বাকি ছিল। মার্কের গাড়ি কাটিয়ে ব্যারিও আর অগ্রসর হতে পারলেন না। পাশাপাশি এসে গাড়ি আচমকা নিথর এবং দৃষ্টিহীন। চাবিখানা শুধু শুধুই পাক খাচ্ছে, কোনও কাজই করছে না।

আশ্চর্য, একই জায়গায় দুটো গাড়িই বিকল! কোন এক জাদুমন্ত্রে যেন বন্ধ হয়ে গিয়েছে বৈদ্যুতিক ক্রিয়াকলাপ। কিছুতেই আর নড়ছে না।

প্রাতরাশ সেরেই বেরিয়ে পড়া হবে, এমনটাই মনস্থ করেছিলেন তিন বিজ্ঞানী। কাল রাতের ঘটনাটি তাঁদের জোর নাড়া দিয়ে গিয়েছে। ফের একবার অকুস্থলে না যাওয়া পর্যন্ত যেন শান্তি নেই। ঋতমরাও হতভম্ব, গাড়ি দুটোর বিটকেল আচরণ এখনও তাদের হজম হয়নি।

ঝকমারিও কি কম গেল কাল রাতে! একে গাঢ় অন্ধকার, তায় কনকনে হাওয়া বইছে, কারও গায়ে তেমন শীতবস্ত্র নেই, ওদিকে ওই অভূতপূর্ব ঝঞ্ঝাট। প্রথমে তো স্থির হল, গাড়ি দুটোকে ঠেলতে ঠেলতে অবজারভেটিরিতে ফেরা হবে। কী বিদঘুটে খেলা রে বাবা! কয়েক

ফিট পিছোতেই গাড়ি যেন আড়মোড়া ভেঙে জেগে উঠল! ওমনি হইহই করে আবার এগোও। কিন্তু আগের জায়গাটিতে পৌঁছে সেই এক হাল। দুটো চার-চাকারই বৈদ্যুতিক কারিকুরি লাটে। বোঝাই যাচ্ছিল, আর অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু প্রোফেসর জটাধরস্যারকে রোখে কার সাধ্যি! তিনি হেঁটে হেঁটেই যাবেন। সবাই মিলে কত বুঝিয়ে যে তাঁকে শান্ত করা গেল। অগত্যা বেজার মুখে প্রত্যাবর্তন। তখন হাতে আর সময়ও নেই, এসেই চোখ রাখতে হল রেডিয়ো-টেলিস্কোপে। মার্ক যেমনটা বলেছিল, তেমনটাই ঘটল অবশ্য। তিনটে চল্লিশে আবার অচেনা সংকেত, ধাতবপাত জ্বলে উঠল সঙ্গে সঙ্গে...!

তখনই নেওয়া হল, সিদ্ধান্তটা। ওই শেষরাতেই। তিন বিজ্ঞানীই একমত, অলৌকিক ঘটনাগুলোকে অনুধাবন করার জন্যে পাহাড়ে গিয়েই আস্তানা গাড়তে হবে।

তা সেই অভিযানের প্রস্তুতি নিতে নিতে বেলা দশটা কাবার। স্নোয়ি মাউন্টেনের শীত নিয়ে বাম্পানা বেজায় ভয় দেখিয়েছে রত্নমালাকে। ভাল করে রোদ্দুর না উঠলে তিনি বেরোবেনই না। জটাধরস্যারের তাড়নায় যা-ও বা গাত্রোত্থান করলেন, তৈরি হতে পাক্কা একঘণ্টা। উলের ড্রয়ার, সোয়েটার, কার্ডিগান, মোজা, গ্লাভস, মাফলার, টুপি, কী না চড়িয়েছেন! হঠাৎ দেখে মহাকাশচারী বলে ভুল হয়। হেক্টর তো গাড়িতে ওঠার আগে তাঁকে বেশ কয়েক বার শুঁকে নিল। যেন চিনেও চিনছে না ম্যাডামকে।

অবশেষে যাত্রা শুরু। মার্ক এবার সঙ্গী হতে পারছে না, নিরীক্ষণকেন্দ্রে তাকে থাকতেই হবে। একটা বাড়তি তাঁবু সে চাপিয়ে দিল গাড়ির ছাদে। যাতে হেক্টর সহ ছ'টি মানুষের পাহাড়ে ঘাঁটি গাড়তে কোনও অসুবিধে না হয়।

কালকের রাস্তাটাই ধরলেন ব্যারি। অন্ধকারে অনেকটা সময় লেগেছিল। দিনের আলোয় মিনিট দশেকের মধ্যেই পৌঁছে গেলেন

সেই বিপজ্জনক জায়গাটায়। সকলেরই চোখে-মুখে উদ্বেগ, না জানি আবার কী ঘটে! কীমাশ্চর্যম, দিব্যি নির্বিবাদে জায়গাটাকে আজ অতিক্রম করে গেল গাড়ি!

আরও একটু এগিয়ে একটা বাঁকের মুখে এসে বাম্পানা বলল, "ব্যস, এখানেই কিন্তু থামতে হবে।"

ব্যারি এদিক-ওদিক তাকিয়ে বললেন, "তাই তো। আমরা তো কশেউস্কু পাহাড়ের প্রায় মাথায় এসে গিয়েছি। আরও উঁচুতে উঠতে হলে ট্রেক করতে হবে।"

স্ট্রাউস বললেন, "আমরা এখানেই ধারেকাছে কোথাও থেকে যেতে পারি না?"

বাম্পানা বলল, "নো প্রবলেম। আমি ঠিকঠাক জায়গায় তাঁবু খাটিয়ে দিচ্ছি।"

গাড়ি থেকে নেমে ঋতম দেখল চারদিকটা। এতক্ষণ ঘন সবুজের মধ্যে দিয়ে আসছিল, খানিক আগে শেষ হয়েছে জঙ্গল, তারপর থেকেই পরিবেশটা কেমন ন্যাড়া ন্যাড়া। পথের দু'ধার বড্ড এবড়োখেবড়ো। লাল লাল রুক্ষ মাটিতে মাঝে মাঝেই প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথরের চাঁই। তার ওপারে, খানিক উঁচুতে উঠলেই সাদা সাদা বরফ। ওইটাই কি মাউন্ট কশেউস্কুর চূড়া? অস্ট্রেলিয়ার সর্বোচ্চ শৃঙ্গের এত কাছে দাঁড়িয়ে আছেন তাঁরা, এ যেন বোঝাই যায় না। বরং এলাকাটাকে ঝাড়খণ্ড বা মধ্যপ্রদেশের কোনও মালভূমির মতো লাগে। একমাত্র হাড়কাঁপানো বাতাসটাই যা বলে দেয়, এ এক অন্য দেশ!

বাম্পানা গাড়ি থেকে জিনিসপত্র নামাচ্ছে। তাড়াতাড়ি গিয়ে হাত লাগাল ঋতম। রাস্তা থেকে বেশ কিছুটা ঢুকে একটা সমতল জায়গা বাছল বাম্পানা। মহা উৎসাহে খুঁটি গাড়ছে তাঁবুর। সঙ্গে চলছে অবিরাম বকবক। যে রাস্তা ধরে তারা এতক্ষণ এল, তার নাম নাকি সামিট রোড। এই রাস্তাই এঁকেবেঁকে চলে গিয়েছে পাহাড় থেকে

পাহাড়ে। এ রাস্তা বেয়েই নাকি পৌঁছোনো যায় অস্ট্রেলিয়ার বিখ্যাত নদী মারের উৎসমুখে। এখানকার অনেক পাহাড়েই বাম্পানা থেকেছে বহুবার। জাগুম্বা নামের এক পাহাড়ে নাকি একবার জোর সাপের ছোবল খেয়েছিল। নেহাত এক জংলি সাহেবের চোখে পড়ে যায়, নইলে তো তখনই বাম্পানার আয়ু শেষ।

একা ঋতম নয়, রত্নমালাও কখন যেন পাশে এসে শুনছিলেন বাম্পানার গল্প। সর্পদর্শনের কাহিনিতে আঁতকে উঠলেন রীতিমতো। চোখ বড় করে বললেন, "সর্বনাশ, পাহাড়ে সাপ আছে নাকি?"

"অস্ট্রেলিয়ার কোথায় সাপ নেই ম্যাডাম?" বাম্পানা নির্বিকার, "আর ব্যাটাদের ছোবলে খুব বিষ। একটা তাইপান সাপের বিষে তেইশ হাজার ইঁদুর মারা যায়।"

"ওরে বাবা! তা হলে খোলা আকাশের নীচে কী করে রাত কাটাব?"

"ভয় নেই ম্যাডাম। আমি আজকাল ব্যাগে একটা পাতা রাখি। ওই পাতা তাঁবুর চারপাশে ছড়িয়ে দিলে সাপ ভুলেও ধারেকাছে আসবে না।"

গল্প শোনাতে শোনাতে তাঁবু খাটিয়ে ফেলল বাম্পানা। একটা নয়, তিন-তিনখানা। গাড়ি থেকে খাবারদাবার, পোশাক আশাক এনে রাখা হল তাঁবুতে। ভাঁজ করা খাট খুলে পাতা হয়ে গেল। এমনকী, টেবিল-চেয়ারও পড়ে গেল। স্ট্রাউস আর ব্যারি বুঝি শিবির সাজাতে বিশেষ দক্ষ, তাঁদের হাতের ছোঁয়ায় দিব্যি ঘর ঘর হয়ে উঠল তাঁবুগুলো।

জটাধরস্যার গলায় পেল্লাই একখানা বাইনোকুলার ঝুলিয়ে কোথায় যেন গিয়েছিলেন। হঠাৎ উত্তেজিত মুখে ফিরলেন, "এখানে একটা রহস্যময় ব্যাপার আবিষ্কার করলাম, বুঝলে!"

স্ট্রাউস বললেন, "কীরকম?"

"এসো, দেখো তো তোমরা কিছু বুঝতে পারো কিনা।"

হুড়মুড়িয়ে বেরিয়ে পড়লেন সকলে। পাথুরে পথে গটগটিয়ে হাঁটছেন জটাধরস্যার, পিছন পিছন বাকিরা। আধ কিলোমিটারটাক যেতেই সামনে শুধু বরফ। পেঁজা পেঁজা তুলোর মতো তুষার মাড়িয়ে পাহাড়ের প্রায় প্রান্তে এসে থামলেন জটাধরস্যার। দূরবীক্ষণ যন্ত্র চোখে লাগিয়ে তাকালেন পুবে। তারপর যন্ত্রটি গলা থেকে খুলে স্ট্রাউসকে বাড়িয়ে দিলেন। তর্জনী তুলে বললেন, "ওই দিকটা দেখো! ওপারটায়।"

গভীর মনোযোগে নিরীক্ষণ করছেন স্ট্রাউস। অস্ফুটে বললেন, "ও তো পাহাড়ের গায়ে জঙ্গল!"

"আর একটু নীচে নামো।"

"জল মনে হচ্ছে! কোনও হ্রদট্রদ?"

"ইয়েস। তবে যে-সে লেক নয়। লেক জিন্ডাবাইন।"

"যাঃ, এখান থেকে লেক জিন্ডাবাইন দেখা যাবে নাকি?"

"আমার হিসেব বলছে, না দেখতে পাওয়ার কোনও কারণ নেই। প্রথমত, এয়ার ডিসট্যান্স দশ কিলোমিটারের বেশি নয়। অর্থাৎ আমার ফিল্ড-গ্লাসের রেঞ্জেই পড়বে। সেকেন্ডলি, আমার ম্যাপ-সেন্স অনুযায়ী লেক জিন্ডাবাইন ওই ডিরেকশনেই। ওটা লেকের উত্তর-পশ্চিম দিক।"

"বটে? তা এর থেকে কী প্রমাণ করতে চাও?"

"কিছুই না। তবে ব্যাপারটা পুরো কাকতালীয় বলেও মনে হচ্ছে না। লেকের ওই স্পট থেকে এই পয়েন্ট একেবারে সরলরেখায়। আর এটাই কেন যেন ভাবাচ্ছে।"

"খোলসা করে বলো।"

"কী করে বোঝাই!" জটাধরস্যার মাথা দোলালেন, "নিজেই এখনও পরিষ্কার হতে পারছি না...!"

"তা হলে আর কী!" ব্যারি হেসে বললেন, "চলো, এবার গিয়ে খাওয়াটা সারি। পরে নয় এটা নিয়ে গবেষণা করা যাবে।"

দ্বিপ্রাহরিক আহারের তালিকা খুব দীর্ঘ নয়। বার্গার, চিপস আর

ল্যামিংটন নামের এক ধরনের ছোট কেক। খিদেয় ঋতমের পেট চুঁইচুঁই করছিল। দু'খানা তাগড়াই বার্গার নিমেষে সাফ। রত্নমালা মিষ্টির পোকা, টপাটপ ল্যামিংটন মুখে পুরছেন। হেক্টর আগেই শুকনো দানা চিবিয়ে নিয়েছিল, তাঁবুর দোরগোড়ায় বসে মুগ্ধ নেত্রে দেখছে রত্নমালার ভোজন।

এমন সময় কোত্থেকে হঠাৎ বিংহামের আবির্ভাব। তাঁবুর দরজায় তাঁর উচ্চস্বর শোনা গেল, "আপনারা তা হলে এখানে এসে ডেরা বাঁধলেন?"

স্ট্রাউস গম্ভীর গলায় বললেন, "আপনি আমাদের খুঁজতে বেরিয়েছেন নাকি?"

"সন্ধান তো রাখতেই হচ্ছে।" বিংহাম অন্দরে এসে টুপি খুলেছেন। সবাইকে ঝলক জরিপ করে নিয়ে বললেন, "দু'-দু'খানা লোক বেপাত্তা হয়ে আমাদের যা ফাঁপরে ফেলেছে... এরপর আপনারাও মিসিং হলে সরকার আমার উর্দি কেড়ে নেবে।"

ব্যারি বললেন, "বসুন। আমাদের সঙ্গে একটু লাঞ্চ করে যান।"

"থ্যাঙ্কস। আমি এখন ডিউটিতে আছি।" বিংহাম গোঁফে হাত বোলালেন, "যাক গে, পুলিশের তরফ থেকে দুটো কথা জানিয়ে যাই। এক, এখানে আগুন জ্বালাবেন না। চা, কফি, খাবার, সবই থ্রেড্‌বো থেকে নিয়ে আসবেন। দুই, কোনও ধরনের ওয়েস্ট এখানে ফেলে যাবেন না যেন! এমনিই তো সামনে টুরিস্ট সিজন, দলে দলে লোক এখানে স্কি করতে আসবে, তখন এই জায়গা সাফসুতরো রাখা দুষ্কর। আমি চাই না তার আগে থেকেই আবর্জনা জমুক।"

জটাধরস্যার চুপচাপ শুনছিলেন। হঠাৎ বললেন, "এখানে আগুন জ্বালানো হয় না বুঝি?"

"একদমই বারণ। দেখতে পেলেই আমরা জরিমানা করব।"

"রোজই কিন্তু রাতে এদিকে একটা ফ্ল্যাশ দেখা যাচ্ছে।"

"তাই নাকি? এ যে নতুন খবর!"

"কেন, আপনাদের কেউ রিপোর্ট করেনি?"

"না তো! এবার তা হলে ওয়াচ রাখতে হবে।" বিংহাম ঠোঁট কুঁচকোলেন, "তা যে কারণে আপনাদের এখানে পদার্পণ, সে ব্যাপারে একটুও এগোতে পারলেন কি?"

"চলছে কাজ।"

"অর্থাৎ গর্ডন স্টিলের দর্শন মেলেনি?" বিংহাম এবার বিপুল বপুটি কাঁপিয়ে হেসে উঠলেন, "আরে মশাই, গুজবের পিছনে ধাওয়া করে কোনও লাভ আছে? গর্ডন ইজ ডেড। ম্যাডামের ভাষায় ভূত।"

"আমরা কোনও নিরুদ্দিষ্টের খোঁজে স্নোয়ি মাউন্টেনে আসিনি, মিস্টার বিংহাম!"

"তাও তো বটে! আপনাদের অন্য অনুসন্ধানও আছে। একটা অনুরোধ করব? আপনাদের সেলফোন নাম্বারগুলো দয়া করে দিয়ে রাখুন। যাতে প্রয়োজনে আপনাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারি।"

"নো প্রবলেম। টুকে নিন।"

নাম আর নাম্বার নোটবুকে লিখতে লিখতে বাম্পানাকে একবার টেরিয়ে দেখলেন বিংহাম। বিগলিত চোখে রত্নমালাকেও। তারপর বেরিয়ে গেলেন দুপদাপিয়ে।

বিংহামের চকিত পরিদর্শনে আবহাওয়াটা কেমন ছানা কেটে গিয়েছে। রত্নমালা হাই তুলে বললেন, "এখন একটু গড়িয়ে নিলে হত না।"

ব্যারি বললেন, "আমারও চোখটা টানছে। কাল সারারাত জাগা, আজ আবার রাতে কী হয় কে জানে!"

ঋতম আর বাম্পানাও তৃতীয় তাঁবুটায় শুতে গেল। লেজ নাড়তে নাড়তে হেক্টরও এসেছে সঙ্গে। সটান উঠে পড়ল বাম্পানার

বিছানায়। শুধু প্রফেসর স্ট্রাউস আর জটাধরস্যারের ক্লান্তির বালাই নেই। কাল রাতে কেন গাড়ি দু'খানা বিগড়োল, তা নিয়ে ফের শুরু হয়েছে দু'জনের তর্কবিতর্ক। জটাধরের মতে কাল পাহাড়ের মাথায় বিশেষ ধরনের কিছু একটা উপস্থিত ছিল। যা কিনা অতি শক্তিশালী চৌম্বকক্ষেত্র তৈরি করে বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি নিষ্ক্রিয় করে দেয়। স্ট্রাউস পুরোপুরি মানতে রাজি নন। তাঁর যুক্তি, গোটা ঘটনাটাই কোনও মহাজাগতিক শক্তির প্রভাব।

শুনতে শুনতে ঋতমের চোখ দুটো কখন যেন জড়িয়ে এসেছিল। ঘুম ভাঙল হেক্টরের চিৎকারে। তাঁবুর বাইরে মুখটুকু বাড়িয়ে ভয়ংকর ডাকাডাকি করছে হেক্টর। চোখ রগড়াতে রগড়াতে বেরোল ঋতম। দেখল ইতিউতি। কই, কিছু নেই তো!

হেক্টরের ডাক আরও বাড়ল। হঠাৎই তিরবেগে ছুটল তাঁবুর পিছনটায়। তারপর আচমকাই গলাটা ঝিমিয়ে গেল যেন। লেজ গুটিয়ে ফিরে এল। কুঁইকুঁই করতে করতে তাঁবুতে সেঁধিয়ে গেল।

গোটা ব্যাপারটার মাথামুন্ডু কিছুই বুঝতে পারছিল না ঋতম। হালকা কৌতুহল নিয়ে পায়ে পায়ে এল তাঁবুর পিছনভাগে।

কী কাণ্ড, একটা লোক দাঁড়িয়ে! মাঝারি হাইট, চওড়া কাঁধ, চৌকো মুখ! আগে কোথায় যেন মুখখানা দেখেছে? কোথায় দেখেছে? কবে দেখেছে?

সহসা ঋতমের মস্তিষ্কে জোর ঝাঁকুনি। আরে, এ তো গর্ডন স্টিল!

তাঁবুর পিছনে ছোটখাটো জটলা। ঋতমের হাঁকডাকে বিজ্ঞানীরা তো বেরিয়ে এসেছেনই, বাম্পানা আর রত্নমালাও হাজির। পাঁচ জোড়া চোখ রীতিমতো গোল গোল। গর্ডন স্টিলকে হঠাৎ সশরীরে দেখে কারওই যেন বিশ্বাস হচ্ছে না।

জটাধরস্যারই প্রথম ধাতস্থ হলেন। দু'কোমরে হাত রেখে সওয়াল ছুড়লেন, "আপনি তা হলে সত্যি সত্যি মারা যাননি?"

নীল পুলওভার পরা শক্তপোক্ত গর্ডন স্টিলের মুখমণ্ডলে কোনও প্রতিক্রিয়াই ফুটল না। জবাবটাও এল অতি সংক্ষিপ্ত, "না।"

"কিন্তু এদিকে তো আপনাদের নিয়ে তুমুল হইচই চলছে। আপনি আর মিস্টার গ্রে দু'জনেই মাছ ধরতে গিয়ে হঠাৎ...," প্রোফেসর জটাধরস্যারের চোখ আরও সরু হল, "লেক থেকে আচমকা ভ্যানিশ হয়ে গেলেন কী করে, বলুন তো?"

উত্তর দেওয়ার প্রয়োজনই বোধ করল না গর্ডন। বিচিত্র ভঙ্গিতে ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছে সবাইকে।

স্ট্রাউস গলাখাঁকারি দিলেন, "আপনাদের ডুবে যাওয়ার সংবাদটি তা হলে ভুল?"

"আমি ডুবিনি।"

"আর বরিস?"

জবাব নেই।

"স্টিভের নৌকোগুলো গেল কোথায়?"

"আছে।"

"আশ্চর্য মানুষ তো আপনারা! নৌকো দুটো হাপিশ করে দিয়ে পাহাড়ে লুকিয়ে বসে আছেন?"

গর্ডন রা কাড়ল না। চোখ দু'খানা শুধু পিটপিট করছে।

রত্নমালা চাপা গলায় প্রোফেসর জটাধরস্যারকে বললেন, "এসব প্রশ্ন করে কোনও লাভ আছে? বোঝাই তো যাচ্ছে ব্যাটারা নৌকো চুরি করে গা ঢাকা দিয়েছে।।"

আজব কাণ্ড, গর্ডনের কানে পৌঁছে গিয়েছে কথাটা! সঙ্গে সঙ্গে উত্তাপহীন স্বর বেজে উঠল, "বোট চুরি যায়নি।"

রত্নমালা হাত নাচিয়ে বললেন, "কোথায় রাখা আছে, দয়া করে বলবেন কি?"

আবার গর্ডনের ঠোঁটে কুলুপ।

ঋতমের ভারী অবাক লাগছিল। লোকটা বেশ খিটকেল তো! আচার-আচরণ যেন কেমন কেমন! চকিত দর্শনের প্রাথমিক ঝাঁকুনিটা সামলে ঋতম করমর্দনের জন্য হাত বাড়িয়েছিল, ভ্রূক্ষেপই করল না লোকটা। এখন প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছে নিজের মর্জিমাফিক। ইনস্পেক্টর বিংহাম বলছিলেন, গর্ডন নাকি আমুদে প্রকৃতির মানুষ। এই কি তার নমুনা? তিন বিজ্ঞানী হঠাৎ নিচু গলায় কী যেন আলোচনা করছেন নিজেদের মধ্যে। কথা থামিয়ে ব্যারি গম্ভীরভাবে বলে উঠলেন, "বুঝেছি। নৌকোর হদিশ আপনি দেবেন না। যাক গে, পুলিশের হাতে ধরা পড়লে বাপ বাপ করে সব বেরিয়ে আসবে।"

শাসানিটা যেন গ্রাহ্যই করল না গর্ডন। দাঁড়িয়ে আছে ভাবলেশহীন মুখে।

ব্যারি হঠাৎ ঝাঁঝের সঙ্গে বললেন, "তা এখন কোথায় ডেরা বেঁধেছেন, সেটা কি জানতে পারি?"

ছোট্ট উত্তর মিলল, "কাছেই।"

"মানে? এই পাহাড়ে? পাহাড়ের কোথায়?"

এবার আর জবাব নয়, গর্ডন পালটা প্রশ্ন জুড়ল। কেটে কেটে বলল, "আপনারা এখানে কেন?"

"অকাজে আসিনি। আপনার মতো আত্মগোপন করেও নেই।" ব্যারির গলায় হালকা শ্লেষ, "আমরা গবেষক। চারদিকে কিছু উলটোপালটা ঘটনা ঘটছে, আমরা তার কারণ খুঁজছি?"

"কী ঘটনা?"

বাম্পানা ফস করে বলে ফেলল, "সে কি এক-আধটা, অনেক আছে।"

"যেমন?"

"এখান থেকে দুশো-আড়াইশো মাইল দূরে জঙ্গলে একটা বেয়াড়া ধরনের আগুন লাগল, তারপর থেকে নাকি এই অঞ্চলের

মোবাইলে কী সব গন্ডগোল...। তারপর ধরুন, জঙ্গলে আমি একটা ম্যাজিক প্লেট কুড়িয়ে পেয়েছিলাম, যেটা আপনা আপনি জ্বলে ওঠে, নিভে যায়...। এর সঙ্গে লেক থেকে আপনাদের উধাও হওয়া তো আছেই। বুঝতে পারলেন?"

"হ্যাঁ। ম্যাজিক প্লেটটা কোথায়?"

"তাঁবুতেই আছে।"

"দেখতে পারি?"

"শিয়োর।"

বলেই বাম্পানা প্রায় ছুট লাগাচ্ছিল, ব্যারি খপ করে তার কাঁধ চেপে ধরলেন। সন্দিগ্ধ চোখে গর্ডনকে জরিপ করতে করতে বললেন, "আপনি ওই প্লেট দেখে কী করবেন?"

ফের গর্ডনের বাক্য উধাও। দৃষ্টিটাও যেন স্থির হয়ে গিয়েছে সহসা।

ব্যারি ছাড়ার পাত্র নন। কড়া গলায় বললেন, "ঝেড়ে কাশুন তো দেখি মিস্টার স্টিল। হঠাৎ ওই পাতটায় আপনার আগ্রহ কেন?"

গর্ডন যেন এবার বেশ ঘাবড়েছে। এক পা, এক পা করে পিছোচ্ছে। হঠাৎই আচমকা শাঁ ঘুরে গেল। হাঁটছে হনহনিয়ে। সবাইকে হতবাক করে দিয়ে একটা বড়সড় পাথরের আড়ালে মিলিয়েও গেল।

দু'-চার সেকেন্ড থতমত দাঁড়িয়ে থেকে বাম্পানা আর ঋতম দৌড়োল পাথরটার দিকে। কিন্তু কী কাণ্ড! পাথরের পর আর রাস্তা নেই। পুরোটাই পাহাড়ের ঢাল। ভয়ংকর এবড়ো-খেবড়ো। খানিক নীচ থেকে শুরু হয়েছে জঙ্গল। তবে ওই ঢালে, জঙ্গলে যতদূর দৃষ্টি চলে, কোথাও গর্ডনের চিহ্নমাত্র নেই। গেল কোথায় লোকটা? কোনও গর্তে লুকোল? নাকি ভোজবাজির মতো হাওয়ায় মিশে গেল?

বেশ খানিকক্ষণ খোঁজাখুঁজি করে হতাশ হয়ে ফিরল দু'জনে। এদিকে তখন আর এক নাটক! হঠাৎ খেপে গিয়েছে হেক্টর। প্রবল হুংকার ছাড়ছে। স্ট্রাউস তার গায়ে হাত বোলাচ্ছেন, ধমকধামক

দিচ্ছেন। কোনও কিছুতেই গর্জন আর থামে না। রত্নমালা তো ভয়ে সিঁটিয়ে এতটুকু। কাঁপছেন ঠকঠক। বাম্পানা এসে অনেক আদর-টাদর করে, অতি কষ্টে হেক্টরকে শান্ত করল বটে, কিন্তু ততক্ষণে রত্নমালার নাড়ি ছেড়ে যাওয়ার জোগাড়!

গর্ডনকে ভুলে হেক্টরকে নিয়েই ভারী চিন্তিত হয়ে পড়েছেন স্ট্রাউস। উদ্বিগ্ন স্বরে বললেন, "আমার ল্যাব্রাডরটি এত উত্তেজিত হয়ে পড়ল কেন বলো তো? এরকম তো ও কখনও করে না।"

ঋতম বলল, "আমার মনে হয় গর্ডনই এর কারণ।"

"তাই কি?"

"হ্যাঁ, স্যার। গর্ডন আসার ঠিক আগে হেক্টর খুব চেঁচাচ্ছিল। তবে গর্ডনকে দেখে সেই যে লেজ গুটিয়ে ভিতরে ঢুকল, একটি বারের জন্যও বেরোয়নি। লোকটা চলে যাওয়ার পর আবার...!"

"হুম, কিন্তু কেন?" স্ট্রাউসের কপালে ভাঁজ। "হেক্টর কি তা হলে গর্ডনের মধ্যে আনক্যানি কিছু ট্রেস করেছে?"

জটাধরস্যার বললেন, "অসম্ভব নয়, গর্ডনের মধ্যে তো পিকিউলারিটি আছেই। ওর কথা বলা, রিঅ্যাকশন, দুম করে চলে যাওয়া, কোনওটাই তো স্বাভাবিক নয়।"

"হ্যাঁ, কেমন দম দেওয়া পুতুলের মতো কথা বলছিল।"

"স্যার, এমন নয় তো, লোকটা হয়তো গর্ডন স্টিল নয়, অথচ আমরা তাকে গর্ডন স্টিল ভাবছি?"

"মানে? তুমি বলতে চাও, ওটা গর্ডনের ভূত?" বাম্পানা হেক্টরকে নিয়ে তাঁবুতে গিয়েছে, একটু একটু করে সমে ফিরছিলেন রত্নমালা। আবার তাঁর চোখে-মুখে শঙ্কা। কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন, "এ কী বিপদে পড়লাম রে বাবা! মুখ ফসকে একবার ভূতের কথা বেরিয়ে গিয়েছিল বলে সত্যিকারের ভূত হানা দিল নাকি?"

"না, না। আমি ভূতের কথা বলিনি ম্যাডাম," ঋতম তাড়াতাড়ি

রত্নমালাকে আশ্বস্ত করল, "যে এসেছিল, সে হয়তো একটা রোবট, গর্ডন স্টিলের মতো দেখতে।"

শুনেই তিন বিজ্ঞানী চোখ চাওয়াচাওয়ি করলেন। স্ট্রাউস মাথা চুলকে বললেন, "এমনটা অবশ্য হতেও পারে। জীবজন্তুদের ঘ্রাণশক্তি অত্যন্ত প্রখর, বিশেষত কুকুরের। সে একটা আস্ত মানুষকে দেখতে পাচ্ছে, অথচ তার গায়ে মানুষের গন্ধ নেই। এটাই হয়তো হেক্টরকে বিচলিত করেছিল। আর অন্য কোনও নক্ষত্র থেকে যদি কেউ সত্যি সত্যি পৃথিবীতে এসে থাকে, তবে তারা নিঃসন্দেহে কোনও উন্নত ধরনের প্রাণী। তাদের পক্ষে অবিকল গর্ডন স্টিলের মতো একটা রোবট তৈরি করা মোটেই কঠিন নয়।"

ব্যারি বললেন, "তা হলে তো গর্ডন স্টিলকে তাদের আগে দরকার।"

জটাধরস্যার বললেন, "সেটাই হয়তো হয়েছে। গর্ডন স্টিল আর বরিস গ্রে-কে তুলে নিয়ে গিয়ে তাদের আদলে দুটো রোবট তো বানিয়ে ফেলাই যায়।"

ব্যারি বললেন, "কিন্তু কেন? উদ্দেশ্যটা কী? খামোকা গর্ডন আর বরিসের রোবট তৈরি করে কী লাভ?"

"হয়তো আমাদের এই গ্রহটা সম্পর্কে তারা একটু ওয়াকিবহাল হতে চায় ওই দুটো রোবটের মাধ্যমে।"

"উঁহুঁ, একমত হতে পারলাম না জে-জে!" স্ট্রাউস মাথা দোলালেন, "প্রথমত, আগন্তুককে যদি আমরা রোবট বলে মেনেও নিই, অন্য রোবটটির সাক্ষাৎ আমরা এখনও পাইনি। অর্থাৎ সে যে আছে, এখনই আমরা ধরে নিতে পারি না। দ্বিতীয়ত, অস্ট্রেলিয়া মহাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব কোণের এই নির্জন পাহাড়ে দু'খানা রোবট ছেড়ে কেউ পুরো গ্রহটা সম্পর্কে একটা ধারণা করে ফেলবে, এটাই ঠিক যুক্তিতে আসে না।"

"ঠিক, একদম ঠিক", ব্যারিও স্ট্রাউসের পক্ষ নিলেন, "রোবট তৈরি করার আলাদা কোনও কারণ আছে?"

"কী হতে পারে কারণটা?"

"ভাবতে হবে প্রফেসর, আর একটু ভাবতে হবে," ব্যারি আলগা হাসলেন, "যদি ভিন নক্ষত্রের প্রাণীরা এসে থাকে, তারা আমাদের থেকে কতটা উন্নত সেটা একবার আন্দাজ করুন। তাদের মহাকাশযান পৃথিবীর মাটি ছুঁয়ে ফেলল, অথচ কোথাও কোনও পর্যবেক্ষণকেন্দ্রই তাদের আগমনটা টের পেল না! তারা মহাকাশে নিয়মিত সংকেত চালাচালি করছে, কিন্তু থ্রেড্‌বো অবজারভেটরি ছাড়া কোথাও তা ধরা পড়ছে না। উপগ্রহের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ তারা বিচ্ছিন্ন করে দিতে পারে। ইচ্ছে করলে আমাদের গাড়ি চলাচল বন্ধ করে দেওয়াটা তাদের কাছে কোনও ব্যাপারই নয়। এমনকী, তারা এমন পদার্থ বানিয়েছে, লেজ়ার বিমও তাতে আঁচড় কাটতে পারছে না। অতএব তারা...!"

"দাঁড়াল, দাঁড়ান", জটাধরস্যার হাত তুলে থামালেন ব্যারিকে। চকচকে চোখে বললেন, "আমি বোধহয় একটা ক্লু পাচ্ছি।"

"কী?"

"ওই প্লেটটা সংগ্রহ করার জন্য হয়তো রোবট বানিয়ে এখানে পাঠানো হয়েছে।"

"এমন কী আছে ওই প্লেটে?"

"হয়তো ওটা ওদের কোনও মূল্যবান যন্ত্র। লক্ষ করেছেন নিশ্চয়ই, একমাত্র সিগনাল চালাচালির সময়েই প্লেটটা জ্যান্ত হয়ে ওঠে?"

"এটা একটা কারণ হতে পারে অবশ্য!" স্ট্রাউস এবার যেন খানিকটা সহমত। চোখ কুঁচকে বললেন, "তবু কয়েকটা প্রশ্ন কিন্তু থেকে যায় জে-জে।"

"যেমন?"

"এক নম্বর, ওরা পৃথিবীতে আদৌ নেমেছে কেন? দুই, যারা এত

উন্নত, তাদের পাঠানো রোবট ইচ্ছে করলেই তো প্লেটটা তুলে নিয়ে যেতে পারত। তা না করে রোবট ভয়ে পালাল কেন?"

"আর-একটা বড় হেঁয়ালিও আছে ফ্রেড," জটাধরস্যার মুচকি হাসলেন, "যাদের আদলে রোবট, তারা এখন কোথায়? মানে গর্ডন আর বরিস? তারা কি আদৌ বেঁচে আছে?"

সূর্য ডুবতেই পাহাড়চূড়ায় ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। ঠান্ডাও যেন ঝুপ করে বেড়ে গিয়েছে অনেকটা। বইছে এক কনকনে হাওয়া, যার ছোঁয়া হাড়েমজ্জায় কাঁপন ধরিয়ে দেয়।

ঋতমদের অবশ্য তেমন একটা সমস্যা হচ্ছিল না। শীতবস্ত্র তো আছেই, সোলার ব্যাটারির কল্যাণে তিন তাঁবুতে আলোও মজুত। পাক্কা বারো ঘণ্টা জ্বলবে বাতিগুলো, অতএব ভোর হওয়া পর্যন্ত নিশ্চিন্ত। শুধু হঠাৎ হঠাৎ দমকা হাওয়া হানা দিচ্ছে তাঁবুতে, এটাই যা অশান্তি। পশমের মোজা, গ্লাভ্স, কান-ঢাকা টুপি পরেও নিস্তার নেই, শুকনো বাতাস যেন ছুরি চালায় নাকে-মুখে। তাঁবুর দরজা বেঁধেছেঁদে স্লিপিংব্যাগে ঢুকে পড়ার আগে পর্যন্ত এটুকু বুঝি সহ্য করতেই হবে।

রাত আটটা বাজে। ডক্টর স্ট্রাউসের তাঁবুতে আড্ডা চলছে জোর। গর্ডন স্টিলকে নিয়ে গবেষণা এখনও শেষ হয়নি। সে কোত্থেকে এল, কেন এল, সে মানুষ না রোবট, হঠাৎ গেলই বা কোথায়, প্রতিটি বিষয়েই তিন বিজ্ঞানীর ভিন্ন ভিন্ন মত। তর্ক বাধছে দুমদাম, উত্তেজিত পণ্ডিতদের তখন শান্ত করা যে কী ঝকমারি!

রত্নমালা একসময় বিরক্ত হয়ে বললেন, "তোমরা আর কান ঝালাপালা কোরো না তো! এবার থামো! ধরে নাও, ওটা গর্ডনের ভূতই ছিল।"

অমনি বাম্পানা তালে তাল দিল, "হ্যাঁ মাড্যাম! দেখুন না, এবার বরিসের প্রেতাত্মারও দর্শন মিলবে।"

"তার আগে খাওয়াদাওয়া করে শুয়ে পড়লে হয় না?"

"শোওয়ার তো এখন প্রশ্নই ওঠে না। হাতে আজ অনেক কাজ।" জটাধরস্যারের সাফ জবাব, "তবে হ্যাঁ, দুপুরের পর থেকে তো পেটে কিছু পড়েনি, সুতরাং নৈশাহারটা সেরে নিলে হয়।"

"উত্তম প্রস্তাব।" স্ট্রাউস এক কথায় রাজি, "আমার সোলার হিটারে তা হলে খাবারদাবার গরম করে ফেলি? সঙ্গে একটু কফিও বানাই?"

সকালের মতোই সাদামাটা আয়োজন। বার্গার, স্যান্ডুউচ, চিপ্‌স...। তবে এবার সঙ্গে যোগ হয়েছে বাম্পানার বাড়ি থেকে আনা আরও দুটো পদ। চাটনি আর মিষ্টি।

অচেনা খাবার দুটো দেখে সন্দিগ্ধ চোখে তাকাচ্ছিলেন রত্নমালা। জিভে আলগা ঠেকিয়ে তিনি দারুণ উচ্ছ্বসিত। আঙুল চাটতে চাটতে বাম্পানাকে জিজ্ঞেস করলেন, "এগুলো কী দিয়ে বানানো হয়েছে গো?"

"টক টক, ঝাল ঝাল চাটনিটা বোগোং মথের। আর মিষ্টিটা মধুপায়ী পিঁপড়ের সঙ্গে...।"

রত্নমালা শিউরে উঠলেন, "এ মা, শেষে পিঁপড়ে, মথ...!"

"তাতে হয়েছে কী?" জটাধরস্যার রগুড়ে গলায় বললেন, "সত্যি কথা বলো তো, খেতে ভাল লেগেছে, না লাগেনি?"

"হ্যাঁ, টেস্টটা তো বেশ। তবে কিনা....!"

"আরে বাবা, দেশে-বিদেশে ঘোরার এটাই তো মজা। কত আজব আজব সুখাদ্যের সন্ধান মেলে বলো তো?"

কথাবার্তার মাঝেই ঋতমের চোখ হঠাৎ ঘড়িতে। ন'টা বারো। সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্কে বিদ্যুতের ঝলক। আপনা আপনি দৃষ্টি আছড়ে পড়ল পাশের ফোল্ডিং টেবিলে। আশ্চর্য, রহস্যময় পাতটা তো আজ ভেলকি দেখাল না?

ঋতম অস্ফুটে বলল, "ম্যাজিক প্লেটের আজ হলটা কী?"

তিন বিজ্ঞানীরও হাত থেমে গেল সহসা। ব্যারি ঘড়ি দেখে থতমত মুখে বললেন, "কে জানে, আজ হয়তো একটু দেরিতে...!"

জটাধরস্যার প্লেট নামিয়ে রাখলেন। ভুরু কুঁচকে বললেন, "দেখাই যাক।"

এক মিনিট, দু'মিনিট, পাঁচ মিনিট, দশ মিনিট... পুরো আধঘণ্টা কেটে গেল, ধাতব পাত তবুও নিথর। স্ট্রাউস গম্ভীর মুখে বললেন, "সামথিং ইজ রং, সামথিং ইজ রং।"

ঋতম নার্ভাস স্বরে বলল, "প্লেটটা অচল হয়ে যায়নি তো?"

জটাধরস্যার কী একটা বলতে যাচ্ছিলেনস হঠাৎ ব্যারির মোবাইল বেজে উঠল। ও প্রান্তে মার্ক নোয়েল্স। এত জোরে কথা বলছে মার্ক, সেলফোনে যেন ঠিকরে আসছে তার গলা।

"স্যার, স্ট্রেঞ্জ ইনসিডেন্ট। আজ নো রেডিয়ো সিগনাল।"

"তাই নাকি?" ব্যারিও উত্তেজিত, "এখানে ম্যাজিক প্লেটও সাইলেন্ট?"

"এই সিগনাল না আসার ব্যাপারটা কিন্তু স্যার আজই প্রথম ঘটল। আফটার দ্যাট এপ্রিল ইনসিডেন্ট।"

"হুম। তুমি অবজার্ভেশান চালু রাখো। আমরা এদিকটা দেখছি।"

"ইয়েস স্যার।"

মোবাইল ফোন অফ করে ব্যারি বললেন, "যাক, একটা ব্যাপারে তা হলে একশো ভাগ নিশ্চিত হওয়া গেল। রেডিয়ো সিগনালের আসা-যাওয়া আর ধাতব পাতের জ্বলে ওঠা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।"

"একদম ঠিক।" জটাধরস্যার ঘাড় নাড়লেন, "তবে কয়েকটা নতুন প্রশ্নও যে এসে গেল ব্যারি?"

"কীরকম?"

"মহাকাশ থেকে সংকেত আসাটা আজ বন্ধ হল কেন? এমন নয়

তো, এদিক থেকেই আগে সিগনাল যায়, ও প্রান্ত থেকে শুধু তার উত্তর আসে?"

স্ট্রাউস বললেন, "তা হলে তো ধরে নিতে হয় এ প্রান্ত থেকে আজ সিগনাল পাঠানো হয়নি।"

"অবশ্যই। কিন্তু কেন পাঠানো হল না? এবং এর পরের প্রশ্ন, এখান থেকে সিগনালটা কে পাঠায়? এই ম্যাজিক প্লেট? যদি তাই হয়, সে আজ নীরব কেন?"

"আমার মনে হয় স্যার...।" ঋতম মাথা চুলকোল, "ঘটনাটা সেরকম না-ও হতে পারে। হয়তো আমাদের প্ল্যানেটে হাজির হওয়া কোনও ইউ এফ ও মহাকাশে সংকেত পাঠায়, সংকেত গ্রহণ করে, আর এই দুটো ঘটনাই ম্যাজিক প্লেটে আপনাআপনি ফুটে ওঠে?"

"তার মানে তুমি বলতে চাও ম্যাজিক প্লেটের মাধ্যমেই সিগনাল চালাচালি হয়?"

"না স্যার। হয়তো ম্যাজিক প্লেটটা সিগনাল আদান প্রদানের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত নয়। তবে এর অজ্ঞাতে সংকেত আসা-যাওয়ার কোনও উপায়ও নেই। অর্থাৎ প্লেটটার কাজ অনেকটা কম্পিউটারের মনিটরের মতো।"

"বেশ, তাই না হয় হল!" জটাধরস্যারের কপালে চিন্তার ভাঁজ, "তা হলে তো বলতে হয়, সেই ইউ এফ ও'টি আজ সিগনাল পাঠানো বন্ধ রেখেছে।"

"সেরকমই তো দাঁড়াচ্ছে স্যার।"

"কিন্তু কেন? হঠাৎ আজই...?"

"আমার ধারণাটা বলব জে-জে?" ডক্টর স্ট্রাউস বললেন, "সম্ভবত গর্ডনের আবির্ভাবের সঙ্গে এর সরাসরি যোগাযোগ আছে।"

"হুম।" জটাধরস্যার বুঝি মেনে নিলেন কথাটা। কপালের ভাঁজ

আরও বাড়িয়ে বললেন, "এখান থেকেই আসছে পরের প্রশ্ন। গর্ডনের সঙ্গে সংকেত চালাচালি বন্ধ হওয়ার কী সম্পর্ক?"

ব্যারি বললেন, "আপনার নিশ্চয়ই স্মরণে আছে প্রফেসর, ধাতব পাতটির কথা শুনেই গর্ডনের, অথবা গর্ডনের মতো দেখতে রোবটটির, একটা প্রতিক্রিয়া জেগেছিল?"

"হ্যাঁ, ঠিকই তো।" জটাধরস্যারের দৃষ্টি উজ্জ্বল। বিড়বিড় করে বললেন, "ওই একটি ব্যাপারেই তো গর্ডন কৌতূহলী হয়ে পড়েছিল।"

রত্নমালা ফস করে বলে উঠলেন, "শুধু কৌতূহল কী গো? আমার তো বিশ্বাস, গর্ডন এই প্লেটটা বাগাতেই এসেছিল।"

"হতে পারে," জটাধর হেসে বললেন, "তা হলে এবার আর-একটা প্রশ্ন এসে গেল। যদি প্লেটটা স্রেফ মনিটর গোছের একটি বস্তুই হয়..., ওটা পেয়ে গর্ডনের কিংবা গর্ডনের পিছনে যারা আছে, তাদের কী সুবিধে হতে পারে?"

রত্নমালা চোখ পাকিয়ে বললেন, "যদি আমিই সব বলে দেব, তোমরা আছ কী করতে?"

চিন্তার ঘূর্ণিপাকে হাঁসফাঁস করছিলেন স্ট্রাউস আর ব্যারি। রত্নমালার কথার ভঙ্গিতে এবার তাঁরাও হেসে ফেললেন। স্ট্রাউস খানিক হালকা গলায় বললেন, "ম্যাডাম ঠিকই বলেছেন। ধাতব পাতটির গুরুত্ব কতখানি তা তো আমাদেরই ভেবেচিন্তে বের করা উচিত।"

জটাধরস্যার হাত উলটে বললেন, "ভাবো। ভাবতেই থাকো।"

"ক্রমাগতই তো ভাবছি জে-জে। একটা দুটো ব্যাপারে তো বেশ খটকা লাগছে।"

"যেমন?"

"পাতটা যদি এতই মূল্যবান হয়, সঙ্গে সঙ্গে সেটা উদ্ধারের চেষ্টা হয়নি কেন? ওরবস্টের জঙ্গলে তো এক-দু'দিন পড়েই ছিল! তারপরও বাম্পানার কাছে অনেক দিন...! আমরাও তো দু'-তিন দিন

ধরে ওটাকে নিয়ে ঘুরছি! অ্যাদ্দিন পর আজ ওদের টনক নড়ল? কারণটা কী? যারা প্রযুক্তিতে এত উন্নত, তারা কি প্লেটটাকে খুঁজে পাচ্ছিল না? এটা কি একটু অদ্ভুত নয়? আর যেদিন খোঁজটা পেল, সেদিন সিগনাল চালাচালি বন্ধ! এ তো আরও অদ্ভুত ঘটনা। তোমার কাছে কি এইসব প্রশ্নের কোনও উত্তর আছে, জে-জে?"

জটাধরস্যারকে একটু যেন হতাশই দেখাল। ছোট্ট শ্বাস ফেলে মাথা দোলালেন।

ব্যারি বললেন, "আমি কিন্তু অন্য একটা দিকে আলোকপাত করতে পারি।"

স্ট্রাউস ঘুরে তাকালেন, "কোন দিকে?"

"সংকেতটা কোথা থেকে যাচ্ছে, সেটা হয়তো এখনও ধরতে পারিনি। তবে কোত্থেকে আসছে, সে সম্পর্কে খানিকটা অনুমান করতে পারি।"

"কীভাবে?"

"সিগনাল যাওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে পালটা সংকেত এসে যাচ্ছে। অতএব আলো এক সেকেন্ডে যত দূর যায়, তার থেকে খুব বেশি দূরে সংকেত প্রেরক বা সংকেত গ্রাহক নেই। অর্থাৎ মহাকাশে যেখানে সংকেত যায়, সেটি পৃথিবী থেকে তিন লক্ষ কিলোমিটারের মধ্যেই আছে।"

স্ট্রাউসের চোখ সরু হল, "তার মানে খুবই কাছে?"

"বলেন কী মিস্টার?" বাম্পানার দৃষ্টি বিস্ফারিত, "তিন লাখ কিলোমিটার কাছে হল?"

স্ট্রাউস হেসে বললেন, "মহাকাশের হিসেব হয় কোটি কোটি কিলোমিটারে। তিন লাখ তো সেই হিসেবে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র।"

কথাটা তাও বাম্পানার মগজে ঢুকল না। হাই তুলে বলল, "আমার বড় ঘুম পাচ্ছে মিস্টার। আমি বরং গিয়ে হেক্টরকে নিয়ে শুয়ে পড়ি।"

রত্নমালারও সেরকমই ইচ্ছে। তবে একা একা তাঁবুতে ফিরতে যেন ঠিক ভরসা পাচ্ছেন না। কাঁচুমাচু মুখে জটাধরস্যারকে বললেন, "তোমরাই বা আর কতক্ষণ জাগবে?"

জটাধরস্যার বললেন, "অন্তত মাঝরাত। যদি সেই ফ্ল্যাশটা দেখা যায়!"

মধ্যরাত্রি পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হল না। তার ঢের আগেই এক অচিন্তনীয় ঘটনা। হঠাৎই এক প্রবল বাতাস। ভয়ংকর ঝড়ের মতো। থরথর করে কাঁপছে তাঁবু। পরক্ষণে এক তীব্র আলোর ঝলকানি। কাছে, খুব কাছে।

থেমে গিয়েছে ঝোড়ো হাওয়া। বিস্ময়ের প্রাথমিক ধাক্কা কাটিয়ে তাঁবু থেকে বেরিয়ে এল সবাই। বাইরে অন্ধকার এখন আর তত গাঢ় নয়। আধভাঙা চাঁদ উঠেছে আকাশে, তার আলোয় আবছা আবছা দেখা যাচ্ছে চারদিক।

ঋতমের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হল সহসা। কশেউস্কু পাহাড়ের মাথায় ওটা কী? ভুতুড়ে ছায়ার মতো!

একা ঋতম নয়, সকলেই নজর করেছেন ছায়াটাকে। আঁধারে ঠিকঠাক ঠাহর করা না গেলেও বুঝতে অসুবিধে নেই, পাহাড়চূড়ার ছায়া নড়ছে না এতটুকু। বিন্দুমাত্র আলো ঠিকরোচ্ছে না, কোনও শব্দও নেই। স্থির বস্তুটি কি কোনও অতিকায় প্রাণী? না কোনও যন্ত্রযান? অথবা অন্য কিছু?

কারও মুখেই কথা ফুটছিল না। হঠাৎ নীরবতা ভেঙে ডক্টর স্ট্রাউস বললেন, "এভাবে বুদ্ধুর মতো দাঁড়িয়ে থাকার তো কোনও মানে হয় না জে-জে। চলো, সরেজমিনে দেখি ব্যাপারখানা কী।"

শুনে রত্নমালা প্রায় আঁতকে উঠলেন, "এই ঠান্ডায়, অন্ধকারে কোথায় যাবেন?"

জটাধরস্যার রত্নমালাকে আমলই দিলেন না। হাত তুলে

হাউসকে বললেন, "এক মিনিট ফ্রেড। আমার লেজার টর্চটা নিয়ে আসি।"

তাঁবুতে ঢোকার আগে আর-এক বিপত্তি। ঝুপ করে নিভে গেল সৌরবাতি। তিন তাঁবুতেই। জটাধরস্যার মুহূর্তের জন্য থতমত, পরক্ষণে সেঁধিয়ে গিয়েছেন অন্ধকার তাঁবুতে। বেরিয়েও এলেন ডেস্ট্রো হাতে। সুইচ টিপে বিস্মিত স্বরে বললেন, "এ কী জ্বলছে না কেন?"

ব্যারি ভুরু কুঁচকে বললেন, "খারাপ হয়ে গেল নাকি?"

"উঁহুঁ, সেরকমটা তো হওয়ার কথা নয়।" জটাধরস্যার রীতিমতো গম্ভীর, "আমরা কি সেই হাই ম্যাগনেটিক ফিল্ডে আছি এখন? যা আমার ডেস্ট্রোকে অচল করে দিয়েছে?"

"বোধহয় সেটাই ঘটেছে স্যার।" ঋতম চাপা গলায় বলল, "এখন তা হলে আমরা কী করব?"

"থেমে থাকার প্রশ্নই নেই। চলো, আন্দাজে আন্দাজে এগোই।"

জটাধরস্যারের উৎসাহ পলকে সংক্রামিত হল অন্যদের মধ্যে। লম্বা লম্বা পা ফেলে সন্তর্পণে হাঁটছেন জটাধরস্যার, পিছন পিছন বাকিরা। চলেছে হেক্টরও, বাম্পানার পাশে পাশে। এবড়োখেবড়ো রাস্তায় হোঁচট খেতে হচ্ছে অল্পবিস্তর, তবু উদ্যমে কারও খামতি নেই।

সাকুল্যে বুঝি পঞ্চাশ মিটারও পেরোয়নি ঋতমরা, হঠাৎই যেন জেগে উঠল ছায়া। আস্তে আস্তে আলোকিত হচ্ছে তার শরীর। ঠিক আলোও নয়, যেন একটা লালচে আভা ফুটে উঠছে।

সবক'টা পা-ই একসঙ্গে থেমে গেল। বস্তুটিকে চিনতে আর ভুল হওয়ার জো নেই। একটি ষড়ভুজ যন্ত্রযান। আকারটি বেশ বড়সড়, উচ্চতায় প্রায় দোতলা বাড়ির সমান। মাথাটা অদ্ভুত রকমের ছুঁচলো, অনেকটা রকেটের মতো।

ব্যারি অস্ফুটে বললেন, "এটাই তবে ওরবস্টের জঙ্গলে নেমেছিল? দাবানলটাও এরই আগমনে ঘটেছে?"

"তাতে আর কোনও সন্দেহ নেই। ওঠা-নামার সময় এর ঘর্ষণেই কিছু গাছ পুড়েছে, আজবভাবে।"

"হুউউম। কিন্তু এখন কি আর এগোনো উচিত হবে?"

"একটু কাছে যাব না?"

"ভয়ংকর বিপদের আশঙ্কা আছে কিন্তু। আমরাও পুড়ে ছাই হয়ে যেতে পারি ডক্টর স্ট্রাউস।"

কথোপকথনের মাঝে হঠাৎই বিকট সুরে ডেকে উঠল হেক্টর। অমনি ঋতম দেখতে পেল যন্ত্রযানের পেটের কাছে আলো বেড়ে গিয়েছে অনেকটা। দুটো গোলক আচমকা ছিটকে বেরোল আলো থেকে। তারপর আলোকিত বল দুটো দিব্যি গড়াতে গড়াতে এগিয়ে এল ঋতমদেরই দিকে। মাত্র হাত দশেক তফাতে পৌঁছে গতি রুদ্ধ হল।

হেক্টরের চিৎকারও থামল তৎক্ষণাৎ। বাম্পানার পায়ের ফাঁকে ঢুকে পড়ল ভয়ে। রত্নমালাও ঠকঠক কাঁপছেন। আঙুল তুলে গোলক দুটোকে দেখিয়ে কী যেন বলতে চাইলেন, কিন্তু গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোল না।

ফুটবলের সাইজের গোলক জোড়া এবার নানান খেলা দেখাতে শুরু করল। আপন মনে ঘুরছে বনবন। থামছে হঠাৎ হঠাৎ। লাল, নীল, বেগুনি, সবুজ, হরেক রঙের আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে গা থেকে। অবশেষে একটা নীলচে আলোয় এসে স্থির হল বিচ্ছুরণ। এবার ক্রমশ লম্বাটে হয়ে যাচ্ছে গোলক দুটো। বেঁকেচুরে দাঁড়িয়ে পড়ল সিধে হয়ে।

এ কী, এ যে জলজ্যান্ত মানুষই বনে গেল! দেখতে দেখতে একটা অবিকল গর্ডন স্টিল, অন্যটা হুবহু বরিস গ্রে! তবে নীলচে আলোর আভাটি কিন্তু মোছেনি, লেগেই আছে দু'জনের সর্বাঙ্গে।

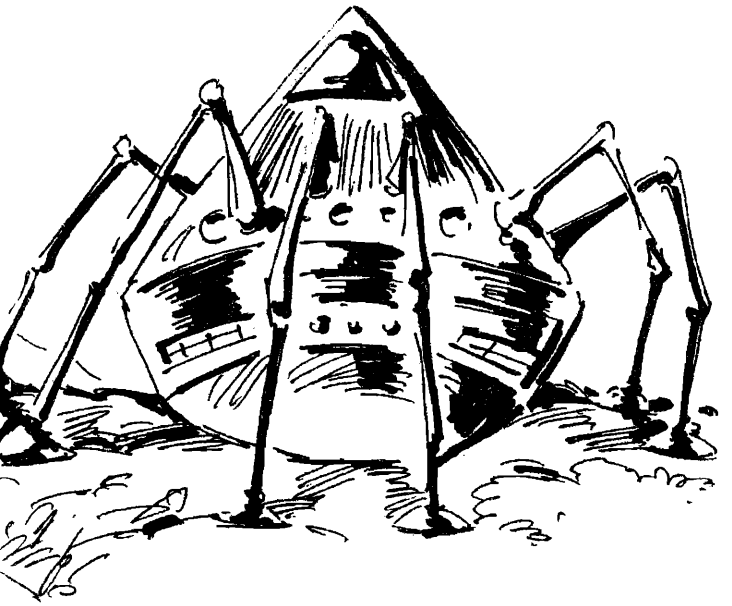

এমন এক চমকপ্রদ ঘটনা প্রত্যক্ষ করে তিন বিজ্ঞানী নিষ্পন্দ ক্ষণকাল। তারপর জটাধরস্যারের স্বর বাজল, "ঋতম তা হলে ঠিকই ধরেছিল। গর্ডন আর বরিসের রোবটই তা হলে কশেউস্কু পাহাড়ে ঘুরছে!"

"গর্ডন নয়," বরিসের গলা শোনা গেল, "হ্যাঁ, আপনাদের গ্রহ আমাদের 'রোবট'ই বলে। আদতে আমরা এই গ্রহের মানুষ নামক প্রাণীটির রেপ্লিকা।"

"মানে? আপনারা এই পৃথিবীর কেউ নন?"

"না। তবে পৃথিবীর মানুষের সঙ্গে আমাদের তেমন কোনও তফাত নেই। আমাদের সেভাবেই গড়া হয়েছে।"

"কে গড়েছে?"

দুই মূর্তি নিশ্চুপ। দু'-চার সেকেন্ড অপেক্ষা করে জটাধরস্যার ধৈর্য হারালেন। কড়া গলায় বললেন, "অ্যাই, স্পষ্ট করে বলো তো তোমরা কে? কোত্থেকে আসছ? তোমাদের মতলবটাই বা কী"

"আমরা আপনাদের প্রতিবেশী নক্ষত্রপুঞ্জের বাসিন্দা। মানে আমাদের যাঁরা গড়েছেন, তাঁরা।"

"প্রতিবেশী নক্ষত্রপুঞ্জ?" স্ট্রাউস চোখ পিটপিট করলেন, "তোমরা কি অ্যান্ড্রোমিডার কথা বলছ?"

গর্ডন ইষৎ মাথা হেলাল, "আপনাদের গ্রহে ওই নামটাই চলে বটে।"

"অ্যান্ড্রোমিডা ছেড়ে পৃথিবীতে পাড়ি দিয়েছ?" ব্যারির চোখে-মুখে গভীর অবিশ্বাস, "জানো, এখান থেকে অ্যান্ড্রোমিডা কত দূরে? পঁচিশ লক্ষ আলোকবর্ষ। অর্থাৎ আলোর গতিতে এলেও তোমাদের পঁচিশ লক্ষ বছর লাগার কথা।"

গর্ডন নাক কুঁচকে বলল, "পৃথিবী কি এতই পিছিয়ে আছে যে, বিজ্ঞানের সাধারণ নিয়মকানুনগুলোও এখানকার অধিবাসীরা জানে না?"

"কোন নিয়মের কথা বলছ?" জটাধরস্যার ভুরু ওঠালেন, "কোনও বস্তু আলোর গতিতে চললে সময়ের মাপটাও বদলে যায়, এটাই তো বলতে চাও? তখন আমাদের স্বাভাবিক পঁচিশ লক্ষ বছরও অনেকটাই কমে যেতে পারে, তাই তো?"

"ঠিকই ধরেছেন। আপনাদের গ্রহের দিন-রাত্রির মাপে এই মহাকাশযানটির এখানে পৌঁছোতে যত সময়ই লাগুক, অ্যান্ড্রোমিডা নক্ষত্রটির হিসেবে তো কিন্তু ঢের ঢের কম। কারণ, এই যান মহাকাশে আলোর গতিতে চলাফেরা করে। তা ছাড়া সেই নক্ষত্রের প্রাণীদের তো জন্ম-মৃত্যু বলে কিছু নেই, সুতরাং অনন্তকাল ধরেও তারা চলতে পারে।"

"সে কী? জন্ম-মৃত্যুই নেই?"

"নাঃ। প্রাণের সৃষ্টি আর বিনাশের পালা সেখানে অনেককাল আগেই চুকে গিয়েছে। তারা শুধু ইচ্ছেমতো নিজেদের বদলে নেয়।"

"কীভাবে?"

"এক বস্তু থেকে অন্য বস্তু বনে যাওয়া কী এমন কঠিন? ভর থেকে শক্তি, শক্তি থেকে ভর, এ তো বিজ্ঞানের প্রাথমিক সূত্র!"

"বাঃ, বাঃ, ওদের তো তা হলে অনেকটাই অগ্রগতি হয়েছে! আমরা তো ভরকে শক্তিতে পরিণত করতেই এখনও হিমশিম খাচ্ছি।" জটাধরস্যারের চোখে-মুখে এবার বেশ সম্ভ্রম জেগেছে। সমীহের সুরে বললেন, "তা হঠাৎ তাঁরা আমাদের এই গ্রহে এসেছেন কেন?"

"এটা নিছকই একটা দুর্ঘটনা। তাঁদের দূত হিসেবে বলতে পারি, তাঁরা এখন খুব বিপন্ন। আশ্রয়ের খোঁজে মহাকাশে ঘুরছেন।"

"কেন?"

"কারণ, তাঁদের বাসস্থান অ্যান্ড্রোমিডার সেই নক্ষত্রটি থেকে তাঁরা আজ বিতাড়িত।"

"বলো কী?" তিন বিজ্ঞানী কোরাসে চেঁচিয়ে উঠলেন, "নক্ষত্র থেকে কাউকে উৎখাত করা যায় নাকি?"

"না না, তাঁরা নিজেদের ইচ্ছাতেই নক্ষত্র ছেড়েছেন। তবে খানিকটা বাধ্য হয়েও।"

স্ট্রাউস বললেন, "স্বেচ্ছায়...আবার বাধ্য হয়ে... কথাটা কিন্তু ঠিক বোঝা গেল না।"

বরিসের রোবট বলল, "তা হলে অ্যান্ড্রোমিডা নক্ষত্রপুঞ্জ সম্পর্কে আপনাদের বিশদে বলতে হয়। আপনাদের এই মিল্কিওয়ের তুলনায় অ্যান্ড্রোমিডার পরিবেশ অনেক ভয়ংকর। সেখানে নক্ষত্রে নক্ষত্রে লড়াই লেগেই থাকে। সময় সুযোগ পেলেই এক নক্ষত্রের বাসিন্দা অন্য নক্ষত্রের প্রাণীদের উপর চড়াও হয়, আর যতক্ষণ না এক পক্ষ পরাস্ত হয়, লড়াই চলতে থাকে, চলতেই থাকে। আমাদের যাঁরা তৈরি করেছেন, যুদ্ধবিগ্রহে তাঁরা একেবারেই অপটু। বহু যুগ আগেই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিলেন, কোনও অবস্থাতেই তাঁরা মারণাস্ত্র বানাবেন না। কারণ, ধ্বংস বা যুদ্ধে তাঁরা বিশ্বাসী নন। এরকমই এক পরিস্থিতিতে তাঁদের উপর আক্রমণ হানে এক শ্বেতবামন নক্ষত্রের প্রাণীরা, এঁরা বিনা যুদ্ধে আত্মসমর্পণ করেন। এঁদের অধিকাংশ অধিবাসী শ্বেতবামনের অধীনতাও মেনে নেন। শুধু কয়েকজন ঘোরতর শান্তিবাদী নক্ষত্র ছেড়ে বেরিয়ে পড়েন এবং অ্যান্ড্রোমিডার গণ্ডি পেরিয়ে তাঁরা ঢুকে পড়েন এই মিল্কিওয়েতে। তা আপনাদের এই সৌরমণ্ডলটি তো মিল্কিওয়ের প্রায় লেজের কাছে, অতএব এই গ্যালাক্সিতে ঢুকেই তাঁরা খোঁজ করতে থাকেন এখানে কোথাও ঠাঁই মেলে কিনা। আপনাদের এই নীল গ্রহটি তাঁদের মোটামুটি পছন্দ হয়েছিল, তাই একটি যান পাঠিয়ে জায়গাটা তাঁরা পরখ করছিলেন।"

"বুঝলাম!" ব্যারি মাথা দোলালেন, "এই যানের কারণেই যত

সব এলোমেলো কাণ্ড ঘটছে। জঙ্গলে উদ্ভট আগুন থেকে উপগ্রহ সংযোগের গন্ডগোল...।" বলেই একটু থমকালেন, "তার মানে যানটি কাছাকাছি কোথাও আড্ডা গেড়েছে, তাই না? লেক জিন্ডাবাইনের নীচে কি?"

"হ্যাঁ। আগন্তুকরা কোনওভাবেই এই গ্রহের প্রাণীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চান না। জঙ্গলে নেমেও তাই দ্রুত সরে এসেছিলেন। কিন্তু জলেও যানটি দীর্ঘক্ষণ থাকতে পারে না। অন্ধকার হওয়ার পর তাকে একবার অন্তত বাইরে আসতেই হয়। তবে এবার মোটামুটি নিশ্চিন্ত, যানটি খুব তাড়াতাড়ি এই গ্রহ ছেড়ে বিদায় নিতে পারবে।"

"চলেই যাবে?" অনেকক্ষণ পর রত্নমালার গলা ঝনঝন, "আমাদের এত সুন্দর পৃথিবীটাকে বুঝি পছন্দ হল না?"

"এখানে ওঁদের খুবই সমস্যা হচ্ছে। প্রথমত, ঘন বায়ুমণ্ডল, দ্বিতীয়ত জল...। আগন্তুকরা এমন একটা বাসস্থান খুঁজছেন, যেখানে জল বা বায়ু কিছুই নেই। মহাকাশে ওঁদের মূল ঘাঁটি থেকে সঙ্গীরা সংকেত পাঠিয়েছেন, তেমন একটা জায়গা পাওয়া গিয়েছে।"

ঋতম কৌতূহলী স্বরে বলল, "কোথায় সেটা? কোন নক্ষত্র?"

"নক্ষত্র নয়, গ্রহ। এই সৌরমণ্ডলেরই। আপনারা যার নাম দিয়েছেন ইউরেনাস। এতদিন ওঁরা সেখানে চলেই যেতেন, তবে...!"

বরিস থেমে গেল, অমনি গর্জন ধরে নিল কথাটা। যান্ত্রিক স্বরে বলল, "যানটি আটকে আছে শুধু একটিই কারণে। তার মূল কন্ট্রোলটি খোয়া গিয়েছে। ওটি ছাড়া মহাকাশে পাড়ি দেওয়া সম্ভবই নয়।"

"ও। তা হলে এখন কী হবে?"

"দুর্ভাবনা কেটেছে। কন্ট্রোলটির সন্ধান মিলেছে এবার।"

"তাই বুঝি?" ঋতমের কেমন খটকা লাগল। চোখ সরু করে বলল, "কোথায় পেলেন যন্ত্রটা?"

"আপনাদের কাছেই আছে। ওই যে, ম্যাজিকপ্লেটের কথা বলছিলেন...!"

"আশ্চর্য, ছোট্ট একটা পাত ছাড়া মহাকাশে ওড়াই যাবে না? কী এমন আছে ওতে?"

"ওই পাতটিই তো যানের স্মৃতিভাণ্ডার। মহাকাশের দিকনির্দেশক এবং তাপনিয়ন্ত্রক। ওই পাত ছাড়া শূন্যে পাড়ি দিলে বায়ুমণ্ডল অতিক্রম করার আগেই যানটি জ্বলে যাবে।"

এতক্ষণে যেন ধোঁয়াশা কাটল অনেকটা। এইজন্যই তবে গর্ডনের রোবট পাতটা দেখতে চাইছিল? ওটিই তা হলে মহাকাশযানের প্রাণভোমরা?

জটাধরস্যার ভারিক্কি গলায় বললেন, "বুঝলাম। ওই প্লেটের মাধ্যমে সংকেতের আদানপ্রদানও চলে।"

"একদম ঠিক।" বরিসের যান্ত্রিক স্বর একটু যেন খাদে নামল, "দয়া করে পাতটি যদি এখন ফেরত দেন...!"

"হচ্ছে, হচ্ছে, তাড়া কীসের। আগে একটা জরুরি কথা জানা দরকার।"

"কী?"

"আসল গর্ডন স্টিল আর বরিস গ্রে কোথায়? তাদের কি মেরে ফেলা হয়েছে?"

"আগন্তুকরা খুনোখুনিতে বিশ্বাস করেন না। তাঁরা হত্যার বিরোধী।"

"তা হলে আগে তাদের খোঁজটা দাও, তারপর পাত পাবে।"

"বেশ। আসুন আমাদের সঙ্গে। আসল বরিস গ্রে আর গর্ডন স্টিলকে দেখতে পেয়ে যাবেন।"

আজব যানটিকে অপলক চোখে দেখছিল ঋতম। সত্যি সত্যি সে তা হলে একটা মহাজাগতিক ব্যোমযানের সামনে দাঁড়িয়ে? যা এসেছে তাদের গ্যালাক্সির বাইরের, কোটি কোটি মাইল দূরের, অন্য

এক ব্রহ্মাণ্ড থেকে? ভাবলেই কেমন রোমাঞ্চ জাগছে। মহাকাশযানটির চেহারাও কী অপরূপ! সর্বাঙ্গ স্ফটিকের মতো এক আবরণে মোড়া। তবে অস্বচ্ছ। সেভাবে কোথাও কোনও আলোটালো নেই, অথচ খোলস ভেদ করে চমৎকার এক দ্যুতি বেরোচ্ছে। নীলচে রঙের। চৌকো পাত থেকে যে রশ্মিটি বেরোয়, ঠিক সেরকম। ইস, রত্নমালা ম্যাডাম আর বাম্পানার দেখা হল না দৃশ্যটা। ম্যাডাম তো ভয়ে এলেনই না। হেক্টরকে সামলাতে বাম্পানাকেও ফিরতে হল তাঁবুতে। বেচারা!

তিন বিজ্ঞানীও নিরীক্ষণ করছেন ষড়ভুজ যানটিকে। বিস্মিত চোখে। ঘোর লাগা গলায় ব্যারি বললেন, "কাঠামোটা কী দিয়ে বানানো বলুন তো?"

স্ট্রাউস বললেন, "মেটিরিয়ালটা মনে হয় ওই নক্ষত্রের কোনও ধাতু বা ধাতুসংকর।"

"এমন একটি পদার্থ যা কিনা চতুর্দিকে ম্যাগনেটিক ফিল্ড তৈরি করে?"

"অবশ্যই।" স্ট্রাউস ঈষৎ রঙ্গ জুড়লেন, "দু'মাইল দূরের গাড়িকেও যা পথে আটকে দেয়। এবং আমাদের মহাপণ্ডিত জোয়ারদারও তখন রাস্তায় দাঁড়িয়ে চুল ছেঁড়েন।"

জটাধরস্যার যেন গায়েই মাখলেন না রসিকতাটা। বুঝি বা খানিক অধীর এখন। যন্ত্রমানবদের উদ্দেশে হেঁকে উঠলেন, "এখানেই দাঁড় করিয়ে রাখবে নাকি? কী দেখাবে দেখাও।"

দুই মূর্তির হেলদোল নেই। নির্বিকার স্বরে গর্ডনের রোবট বলল, "অন্দরে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ চলছে। ভিতরের আর বাইরের তাপমাত্রা সমান হলে তবেই দরজা খুলবে।"

অগত্যা ফের অপেক্ষা। শেষে মিনিট পনেরোর মাথায় ষড়ভুজের একটা বাহু সামান্য ফাঁক হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে এক জোর বাতাসের

ঝাপটা। পরমুহূর্তে কে যেন শোঁ করে টানল এবং কিছু বোঝার আগেই গোটা দলটা যানের অন্দরে।

সংবিৎ ফিরতেই ঋতম দেখল, তারা একটা গোলাকার বদ্ধ জায়গায় দাঁড়িয়ে। দেওয়াল, মেঝে, সিলিং সবই বাইরের মতো স্ফটিকে তৈরি। সেই একই নীলাভ দ্যুতি ফুটে আছে কক্ষে। নীলচে আলো গায়ে মেখে খানপাঁচেক বিচিত্রদর্শন প্রাণীও মজুত। লম্বায় মেরেকেটে ফুট তিনেক, চোঙের মতো আকৃতি, হাত-পা-ধড়-মাথা বলে কিছু নেই, শুধু ছোট-বড় শুঁড় বেরিয়ে আছে অজস্র। সরু সরু শুঁড়গুলো নড়ছে এদিক-ওদিক, আর অমনি টুপটাপ আলো জ্বলছে, নিভছে।

একটি চোঙা থেকে শুঁড় মারফত আলো এসে পড়ল বরিসের উপর। সঙ্গে সঙ্গে বরিস বলে উঠল, "ভিন নক্ষত্রের আগন্তুকরা আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছেন।"

ব্যারি অবাক মুখে বললেন, "কীভাবে জানালেন? কিছু শুনতে পেলাম না তো!"

"এঁরা শব্দ করেন না। আলোর ভাষায় কথা বলেন।"

"তাই নাকি? তা আমাদের কথা বুঝবেন কী করে?"

আবার আলোর প্রক্ষেপণ। এবার গর্ডনের উপর। গর্ডন বলল, "আগন্তুকরা জানাচ্ছেন, শব্দকে এঁরা আলোয় বদলে নেন।"

স্ট্রাউস কাঁধ ঝাঁকালেন, "হ্যাঁ, শক্তির রূপান্তর তো ঘটতেই পারে।"

ব্যারি বললেন, "কিন্তু শব্দকে আলোয় পরিণত করা কি যে-সে কাজ?"

জটাধরস্যার নিচু গলায় বললেন, "বোঝাই তো যাচ্ছে এঁরা অনেক কিছু পারেন। দেখছেন না, কেমন দু'-দু'খানা রোবট বানিয়েছেন! মানুষের মুখোমুখি হলে তারা দিব্যি মানুষ। আবার এঁদের আলোর ভাষাও গড়গড়িয়ে পড়তে জানে। কত উচ্চস্তরের কম্পিউটারের পক্ষে এই জটিল কাজটি সম্ভব, সেটা একবার ভাবুন।

তবে এত যাঁদের মেধা, গর্ডন আর বরিসের মতো দুটি নিরীহ মানুষকে লোপাট করা তাঁদের বোধহয় মানায় না।”

সামনের প্রাণীরা বুঝি ধরতে পেরেছে কথাগুলো, হয়তো বা শব্দকে আলোয় রূপান্তরিত করেই। অদ্ভুত এক চাঞ্চল্য জাগল চোঙগুলোয়। অসংখ্য শুঁড় দুলছে জোরে জোরে। নানা বর্ণের আলো গিয়ে পড়ছে কখনও বরিসে, কখনও গর্ডনে।

ঝটিতি গর্ডনের রোবট বলে উঠল, “আগন্তুকরা আপনাদের কাছে ক্ষমা চাইছেন।”

“কেন?”

“ওঁরা বলছেন, এই গ্রহের কোনও প্রাণীকে অপহরণ করা ওঁদের উদ্দেশ্য ছিল না। একরকম বাধ্য হয়েই কাজটি তাঁদের করতে হয়। কারণ, হারানো নিয়ামক যন্ত্রটি ফিরে পাওয়া অত্যন্ত জরুরি ছিল। আর স্থানীয় প্রাণীদের আদলে রোবট বানালে যন্ত্র খোঁজার কাজটি যে সহজ হয়, এটাও তাঁরা বুঝেছিলেন। সৌভাগ্যের বিষয়, রোবট নির্মাণ বৃথা যায়নি। সময়ও বেশি নষ্ট হয়নি। আপনারাই যন্ত্রটি নিয়ে পাহাড়চূড়ায় পৌঁছে গিয়েছেন। আগন্তুকরা সেইজন্য আপনাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতাও জানাতে চান।”

“বুঝলাম।” স্ট্রাউস মাথা নাড়লেন, “কিন্তু গর্ডন স্টিল আর বরিস গ্রে-কেই বা বাছা হল কেন? কী দেখে?”

“ওটা নেহাতই চান্স ফ্যাক্টর। নৌকো চালাতে চালাতে ওরা যানটির খুব কাছে এসে পড়েছিল। তখনই চৌম্বকশক্তি ওদের টেনে নেয়। আর ওদের পেয়েই রোবট তৈরির পরিকল্পনাটা আগন্তুকদের মাথায় আসে।”

“আশ্চর্য!” জটাধরস্যার এবার হেসে ফেললেন, “আপনারা বিজ্ঞানে এত উন্নত, অথচ সামান্য একটা যন্ত্র খুঁজতে আপনাদের এত

কাঠখড় পোড়াতে হয়? বাম্পানার ব্যাগে যখন ছিল, তখনই তো যন্ত্রটি বাগিয়ে নেওয়া যেত। চৌম্বকশক্তি দিয়ে বাম্পানাকে জঙ্গল থেকে তুলে আনাও খুব কঠিন কাজ ছিল না।"

আবার শুঁড়ের নড়াচড়া। আলোর নির্দেশে আবার বরিসের ঠোঁট নড়ছে, "দুটো অসুবিধে ছিল। প্রথমত, ওই যন্ত্রটি ওঁদের মূল নিয়ামক। এর মাধ্যমে অন্য বস্তুর অবস্থান নির্ণয় করা যায়। কিন্তু অন্য কোনও যন্ত্র দিয়ে ওটি খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। বিশেষ নিরাপত্তার কারণে যন্ত্রটিকে ওইভাবেই তৈরি করা হয়েছে। তাই ওটা ঠিক কোথায় হারিয়েছে ওঁরা বুঝে উঠতে পারেননি। দ্বিতীয়ত, সন্ধান মিললেও কোনও কিছু কেড়ে নেওয়া ওঁদের স্বভাবে নেই। যে নীতি মেনে ওঁরা নিজেদের বাসভূমি ছেড়ে এসেছেন, সেটাকে ভাঙেন কী করে? অতএব যতক্ষণ না কেউ স্বেচ্ছায় যন্ত্রটি ওঁদের ফেরত দেন, অথবা ওঁদের পাঠানো রোবট বলপ্রয়োগ ছাড়াই ওটি সংগ্রহ করে, ততদিন তো ওঁদের অপেক্ষা করতেই হবে।"

"তার মানে, আমরা যদি এখন যন্ত্রটি না দিই, আপনারা কেড়ে নেবেন না?"

"অবশ্যই না। তবে আপনাদের শুভ বুদ্ধির উপর ওঁদের ভরসা আছে।"

"ভারী মজাদার তো! বিজ্ঞান আর প্রযুক্তিতে বিপুল উন্নতি করেও এত নিরীহ? এ তো ভাবাই যায় না!"

"যুদ্ধ নয়। শান্তিই উন্নতির রাস্তা। আগন্তুকরা এরকমটাই বিশ্বাস করেন।"

ঋতম চোখ গোল গোল করে রোবট মারফত কথোপকথন গিলছিল। ফস করে বলল, "একটা প্রশ্ন করতে পারি? আপনারা আমাদের গ্যালাক্সিতেই এলেন কেন? আর এলেনই যদি, এত গ্রহ-নক্ষত্র থাকতে ইউরেনাসে চলেছেন কেন?"

কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই জবাব এল, "ইউরেনাস মোটামুটি শীতল এবং শুকনো গ্রহ। জল নেই, বায়ুমণ্ডল নেই, আগন্তুকদের আদি বাসস্থানের সঙ্গে ইউরেনাসের অনেক মিল। ওখানে কোনও প্রাণও নেই বলে হানাহানির আশঙ্কাও নেই, এটাও একটা বাড়তি সুবিধে। আর মিল্কিওয়েতে আসার কারণ, এই ব্রহ্মাণ্ডটি অ্যান্ড্রোমিডার প্রতিবেশী এবং খুবই কাছে। এখানে থাকলে ছেড়ে আসা নক্ষত্রের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা সহজ হয়।"

ঋতম হকচকিয়ে জটাধরস্যারের দিকে তাকাল। পঁচিশ লক্ষ আলোকবর্ষের দূরত্বটা এঁদের কাছে এতই নগণ্য? অ্যান্ড্রোমিডা যেন পাশের পাড়া!

জটাধরস্যার ছাত্রের ভাবনা পড়ে ফেললেন। হাসলেন মিটিমিটি। হাসতে হাসতেই শুঁড়ওয়ালা চোঙগুলোর দিকে ফিরে বললেন, "আপনাদের নক্ষত্র ছেড়ে আসা বাকি সঙ্গীরা এখন কোথায়?"

"মূল মহাকাশকেন্দ্রে।"

"সে তো বুঝলাম। তা সেটি কদ্দুরে? কোন গ্যালাক্সিতে?"

"আপনাদের মিল্কিওয়েতেই আছে তারা। তিন আলোক সেকেন্ড দূরত্বে।"

"কী কাণ্ড, এত কাছে অথচ সিগনালগুলো থ্রেড্‌বো ছাড়া পৃথিবীর আর কোনও মানমন্দিরে ধরা পড়ে না কেন?"

"সেভাবেই যে ব্যবস্থা করা আছে। এই যানটির পঞ্চাশ কিলোমিটার ব্যাসার্ধের বাইরে কোনও যন্ত্রেই সংকেত আদান-প্রদান ধরা পড়বে না। বিশেষ নিরাপত্তার কারণেই এই সতর্কতা।"

"ও। তাই বোধহয় ওরবস্টের জঙ্গলে আপনাদের নিয়ামক যন্ত্রটি সচল হয়নি? বাম্পানাও তাই টের পায়নি যন্ত্রটির লীলা।"

ব্যারি হেসে বললেন, "ভাগ্যিস, বাম্পানার সঙ্গে আমাদের দেখা

হয়েছিল! ভাগ্যিস, আমরা লেক জিন্ডাবাইনের দিকেই আসছিলাম! নইলে ওই প্লেটটা তো বিলকুল অকেজো হয়েই পড়ে থাকত। আর দু'খানা রোবট কশেউস্কু পাহাড়ে বৃথাই চরে বেড়াত অনন্তকাল।"

এমন একটা পরিহাসেও বরিস আর গর্ডনের রোবটের এতটুকু ভাবান্তর নেই। যান্ত্রিক স্বরে বলল, "এবার কি আপনারা নিয়ামক যন্ত্রটি হস্তান্তর করবেন?"

ম্যাজিকপ্লেট জটাধরস্যারের পকেটেই। যানটির কাছে আসার সময়েই পুরে নিয়েছেন। সাবধানে বের করলেন কোটের পকেট থেকে। হাতে নিয়ে থমকালেন। ভারী গলায় বললেন, "কিন্তু আমাদের শর্ত তো এখনও মানা হয়নি। মানুষ-বরিস আর মানুষ-গর্ডনকে যে আমরা চাই।"

এবার একটা মাত্র চোঙা নড়ে উঠল। দুলছে তার শুঁড়। বরিসের গলায় জবাব দিল, "এক্ষুনি পেয়ে যাবেন। শুধু তাই নয়, যন্ত্রমানবদেরও কাজ শেষ, এবার তাদেরও ছুটির পালা।"

বাক্যটি ফুরিয়েছে কি ফুরোয়নি, অমনি এক তীব্র আলোর ঝলক আছড়ে পড়ল দেওয়ালে। সঙ্গে সঙ্গে অস্বচ্ছ স্ফটিক সরে গেল। ওপাশে আর-একটি কক্ষ। সেখানে প্রকাণ্ড এক স্ফটিকের পাত্রে শুয়ে আছে হিমায়িত দুটি দেহ। বরিস আর গর্ডনের। পাত্রটির পাশে শোভা পাচ্ছে রবারের নৌকো দু'খানাও। ভিন নক্ষত্রের প্রাণীরা হেলেদুলে কক্ষটিতে ঢুকে পড়লেন। কয়েক সেকেন্ড আলোর ফুলঝুরি, তার পরেই গর্ডন আর বরিস উঠে দাঁড়াল। অবাক দৃষ্টিতে দেখল চারদিক। নৌকো দুটোর গায়ে হাত বোলাল বারকয়েক। স্বাভাবিক পায়ে কক্ষ থেকে বেরিয়ে এল যে-যার নৌকো নিয়ে। যেন কিছুই হয়নি তাদের, যেন এক্ষুনি লেকে মাছ ধরতে নেমে পড়বে, এমন একটা হাবভাব। দেখে ঋতমের চোখ কপালে।

তবে বিস্ময়ের আরও কিছু বাকি ছিল। দুই হাট্টাকাট্টা রোবট সহসা

ছোট হতে শুরু করল। পলকের মধ্যে ফের গোলক বনে গেল। আরও কমছে, আরও কমছে... কমতে কমতে স্রেফ দুটো পাথরের ঢেলা।

প্রাথমিক অভিঘাত কাটিয়ে জটাধরস্যার পাথর দুটো হাতে তুললেন। অস্ফুটে বললেন, "এ কী, এ তো নরমাল স্টোনে পরিণত হল?"

স্ট্রাউস বললেন, "ভর থেকে শক্তি, ফের শক্তি থেকে ভর! আশ্চর্য, রূপান্তরটা কেমন নিমেষে ঘটে গেল! এ কী করে সম্ভব জে-জে? বিস্ফোরণ দূরে থাক, একটা শব্দ পর্যন্ত হল না?"

জটাধরস্যার মতামত দেওয়ার ফুরসত পেলেন না। যানটি হঠাৎ বিশ্রীভাবে কাঁপছে। পরক্ষণে তীব্র এক ধাক্কা। কী হচ্ছে বোঝার আগে যান থেকে ছিটকে বেরিয়ে এল সবাই।

এবং সঙ্গে সঙ্গে জোর বাতাস। ঝলক আলো। ঋতম স্তম্ভিত হয়ে দেখল মহাকাশযানটা উবে গিয়েছে।

কলকাতায় ফিরে এসেছে ঋতমরা। আবার পূর্ণোদ্যমে শুরু হয়েছে গবেষণার কাজ, আগ্নেয়গিরি নিয়ে।

অস্ট্রেলিয়ায় কয়েকটা দিন বেশ কাটল বটে! এখনও যেন স্বপ্ন স্বপ্ন মনে হয়! আজব দাবানলের উৎস খুঁজতে গিয়ে কোন আজব জগতে যে পৌঁছে গিয়েছিলেন তাঁরা। ওরবস্টের জঙ্গল, জিন্ডাবাইন লেক, কশেউস্কুর চূড়া, এমনকী, সেই অ্যান্ড্রোমিডা থেকে আসা মহাকাশযান পর্যন্ত। শুঁড়ওয়ালা প্রাণীগুলোকে তো এখনও চোখ বুজলেই দেখতে পায়। যাক বাবা, ভিন নক্ষত্রের অহিংস প্রাণীরা চলে গিয়েছে ভালয় ভালয়। গর্ডন আর বরিসও যে-যার দুনিয়ায় ফিরেছে। দু'জনেই অবশ্য ই-মেলে যোগাযোগ রাখে ঋতমের সঙ্গে। থ্রেড্‌বো মানমন্দিরের মার্ক নোয়েল্‌সও বৈদ্যুতিন পত্র পাঠায় নিয়মিত। এখনও নাকি ইনস্পেক্টর বিংহাম তাঁর পিছু ছাড়েননি। হুটহাট হানা দিয়ে জানতে চান, গর্ডন

আর বরিসকে সত্যি সত্যি কীভাবে খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল। বোঝাই যায়, মহাকাশযানের বৃত্তান্তটি তিনি এখনও বিশ্বাস করেননি। জটাধরস্যার বলছিলেন, ডক্টর স্ট্রাউস আর প্রোফেসর ব্যারিকেও নাকি মাঝে মাঝে ফোনে জেরা করেন বিংহাম। রত্নমালাকেও দারোগাসাহেব ভুলতে পারছেন না। ইন্ডিয়ান ফ্যাট লেডি কী যে ভূতের মন্ত্র শুনিয়েছিলেন তাঁকে!

একমাত্র বাম্পানার সঙ্গেই ঋতমের আর কোনও সংযোগ নেই। সে তো কম্পিউটারের ধার ধারে না, কোথায় কোন জঙ্গলে বসে আপন খেয়ালে ডিজিরিডু বাজাচ্ছে কে জানে! কী খ্যাপা রে বাবা, বিদায় নেওয়ার আগে বাদ্যযন্ত্রটা ঋতমকে প্রায় দিয়েই দিচ্ছিল! বুঝতেই চায় না, অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের ওই প্রকাণ্ড শিঙাটি ফোঁকা ঋতমের কম্মো নয়।

তবে ঋতম স্মারক একটা বয়ে এনেছে। সেই দু'টুকরো পাথর। যারা কিনা একসময় যন্ত্রমানব ছিল। ওই পাথরের স্মৃতি কি কম মূল্যবান!

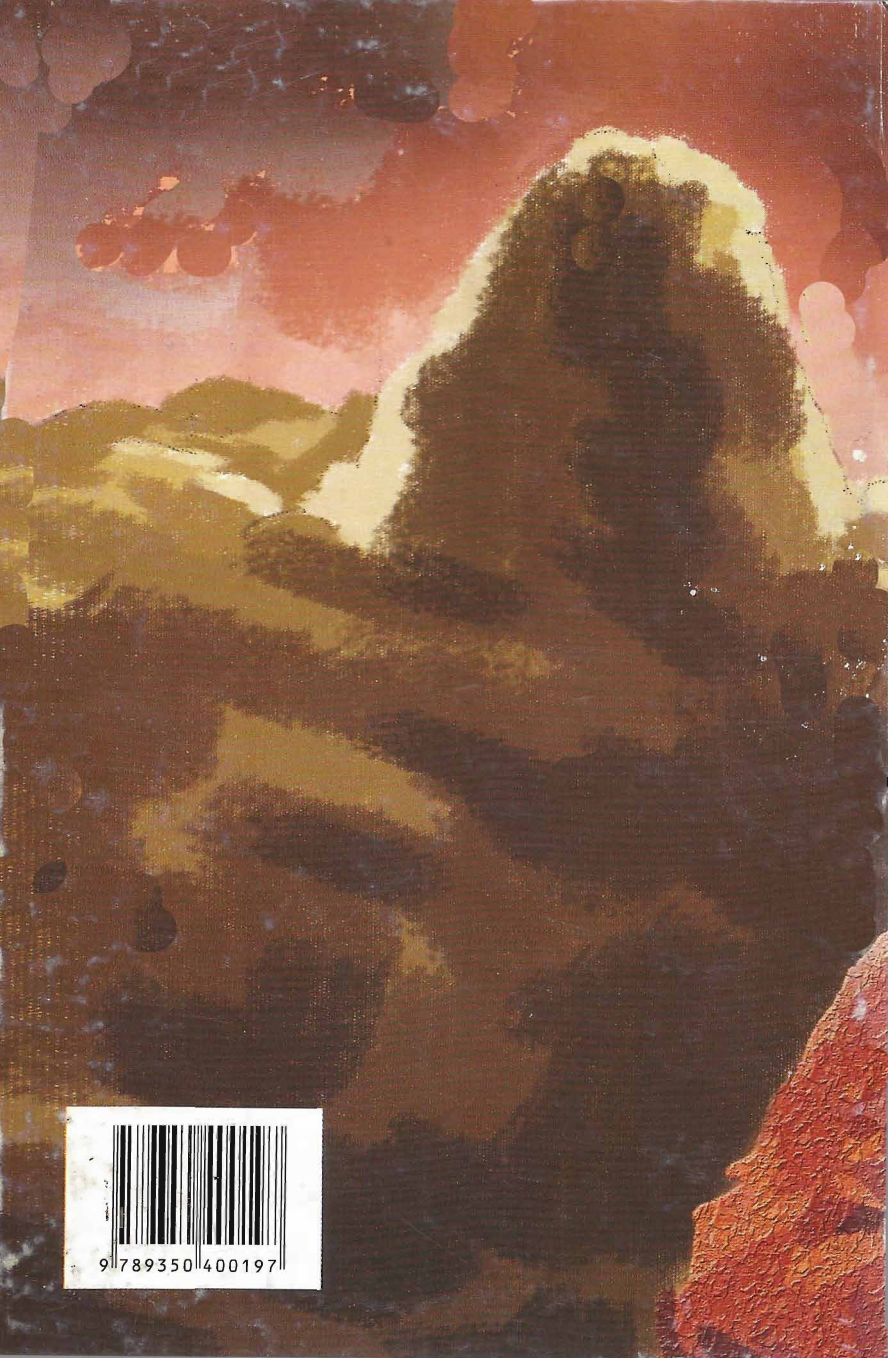

9 789350 400197